Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রিযিক

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সৈয়দা তাসনীম জাহান

রোলঃ 23090120802

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রিযিক

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সৈয়দা তাসনীম জাহান

রোলঃ 23090120802

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " রিযিক " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সৈয়দা তাসনীম জাহান, আইডিঃ 23090120802 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রিযিক " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Syeda Tasneem Jahan

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সৈয়দা তাসনীম জাহান

আইডিঃ 23090120802

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5
রিযিক 7
রিযিকের স্তর 9
রিযিকের ফায়সালা হয় আসমানে 13
রিযিক কি নির্ধারিত 16
তাক্বদীর ও রিযিক 20
হালাল ও হারাম রিযিক 22
রিযিকের পরিমাণ কি বাড়ে-কমে? 26
রিযিক কেন হ্রাস পায় 28
রিযিকে বরকত 37
সদাকা অনুগ্রহ নয় 46
জ্ঞানার্জন রিযিকেরই একটি রূপ 48
মুমিন কখনো হতাশ হয় না 51
দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষেরা 53
রিযিকে সংকীর্ণতা দূর করার কুরআনী নুসখা 55
হাদিসের আলোকে রিযিক বৃদ্ধির জন্য কিছু দু'আ 60
পরিশেষে 62

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহাশক্তিশালী এবং সকল কিছুর রিযিকদাতা আল্লাহ তাআ'লার জন্য।দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি।তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের প্রতি এবং যারা তাঁর পথ অনুসরণ করছেন তাদের প্রতি।

একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই রিযিকদাতা।তিনি সকল সৃষ্টিকে রিযিক দান করেন।যাকে ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা রিযিক দেন।ঊর্ধ্বজগতে ও নিম্নজগতে এমন কোনো প্রাণি নেই যা আল্লাহ তাআ'লার রিযিক ভোগকারী নয়।তাঁর দয়া ও দানে নিমজ্জিত নয়।পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন—

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۞ ُ

—"আল্লাহ্ নিজেই তো রিযিকদাতা এবং তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।"

[যারিয়াত:৫৮]

একমাত্র তিনিই রিযিকদাতা ও রিযিক প্রশস্তকারী।বান্দার রিযিকের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করে নিয়েছেন;নিজ দয়া ও অনুগ্রহে।স্বেচ্ছায় আপন সুমহান সত্তার ওপর জরুরি করে নিয়েছেন।মহান আল্লাহ এই বিশাল পৃথিবীর গর্ভে রেখেছেন অগণিত খনি ও ধনভাণ্ডার।এগুলো দ্বারা মহাবিশ্বের সকল জাতি-উপজাতির প্রয়োজন পূরণ হয়।প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে তিনি দিয়ে দিয়েছেন জীবিকা উপার্জনের ক্ষমতা।হোক তা উৎপন্ন শস্য বা কারিগরি শিল্প বা যৌগিক পদার্থ কিংবা অন্য কিছু।সবই আল্লাহ তাআ'লার দান।
আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ- ٍ

—"ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোনও প্রাণী নেই, যার রিযক আল্লাহ নিজ দায়িত্বে রাখেননি। তিনি তাদের স্থায়ী ঠিকানাও জানেন এবং সাময়িক ঠিকানাও। সব কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।"

[সূরা হুদ:৬]

আল্লাহ দুনিয়াকে করেছেন মানুষের চোখে আকর্ষণীয়।তিনি দুনিয়াকে লোভনীয় বস্তুসমূহ-ধনসম্পদ দ্বারা ভরপুর করেছেন মানুষ ও জীনজাতিকে পরিক্ষার জন্য।

মু'মিনের করণীয় হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিজেদের জ্ঞানের দ্বারা হালাল-হারামের পার্থক্য করে হালাল রিযিক দুনিয়ায় অন্বেষণ করা এবং আল্লাহ তাআ'লার কাছ থেকে নেক আমলের মাধ্যমে উত্তম রিযিক চেয়ে নেয়া।

রিযিক

রিযিক (رزق) শব্দটি আরবি।যার অর্থ হলো জীবিকার ব্যবস্থা, রোজগার বা জীবন ধারণের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে দেয়া প্রদত্ত অনুগ্রহ।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে রিযিক শুধু
টাকা-পয়সা বা খাবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।
বরং এতে অন্তর্ভুক্ত হয়
খাদ্য ও পানীয়,স্বাস্থ্য ও সুস্থতা,জ্ঞান ও প্রজ্ঞা,নেককার জীবনসঙ্গী-সন্তান,শান্তি ও সন্তুষ্টি,ভালো সম্পর্ক ও সুযোগ।

কুরআনে আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۝

—"আর আসমানেই আছে তোমাদের রিযিক এবং তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তাও।"

[সূরা যারিয়াত ৫১:২২]

অর্থাৎ,আল্লাহই প্রত্যেক জীবের রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন।কেউ পায় বেশি,কেউ কম তা তাঁর হিকমত ও পরিক্ষা অনুযায়ী দিয়ে থাকেন।

রিযিক দুই রকম।

১.বাহ্যিক রিযিক
বাহ্যিক রিযিক বলতে আমরা সে সকল দৃশ্যমান ও ব্যবহারযোগ্য সম্পদকে বুঝি, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনকে সহজ ও সমৃদ্ধ করে।
যেমন,টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, খাদ্য-দ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, যানবাহন এবং জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ।
এগুলো মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দানকৃত স্পষ্ট ও বাহ্যিক রূপের রিযিক।

২.আধ্যাত্মিক রিযিক

আধ্যাত্মিক রিযিক হলো সেই সকল অদৃশ্য, অন্তর্নিহিত ও আত্মিক সম্পদ, যা মানুষের হৃদয়কে শান্তি, শক্তি ও নৈতিক দৃঢ়তা প্রদান করে।

যেমন, ঈমান, হিদায়াত, নৈতিকতা, হৃদয়ের প্রশান্তি, ভালোবাসা, সন্তুষ্টি, সঠিক পথে চলার তৌফিক, দোয়ার কাবুলিয়াত, আল্লাহর নৈকট্য এবং অন্তরের পরিশুদ্ধতা।

এসব রিযিক মানুষের চরিত্র গঠনে, আচরণ উন্নত করতে এবং আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ হতে সহায়তা করে।

রিযিক নিয়ে কিছু ধারণা আছে যেগুলো ভুল।যেমন,

শুধু কপাল ভালো হলে রিযিক আসে—

—কথাটা ভুল। চেষ্টা, দু'আ, ধৈর্য্য ও তাকওয়া থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

অন্য কারো রিযিক আমি নিয়ে নিতে পারি—

—নাহ্।প্রতিজনের রিযিক নির্দিষ্ট।কেউ কারো রিযিক নিতে পারে না।

রিযিক মানে শুধুই টাকা—

—না রিযিক মানে শুধুই টাকা-পয়সা নয়।রিযিকের পরিধি অনেক বিস্তৃত।

মূলত,**রিযিক** হলো আল্লাহর দেয়া সেই সমস্ত অনুগ্রহ যা মানুষের জীবনধারণ ও উন্নতির জন্য প্রয়োজন।আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য নিরবচ্ছিন্ন দান।

এটি শুধু পেট ভরানোর বস্তু নয় বরং জীবনকে সুন্দর,নিরাপদ ও অর্থপূর্ণ করার সবকিছুই রিযিকের আওতায়।

রিযিকের স্তর

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার পক্ষ থেকে তার বান্দার নিকট আসা রিযিক বান্দার প্রতি অনেক বড় নেয়ামত।
জীবন পরিচালনায় একটা মানুষের যা যা লাগে সবই রিযিক।
আমরা অনেকে বুঝি যে,যেটা আমরা খাই,যেটা আমরা উপার্জন করি শুধু এটাই রিযিক।তবে এটা আংশিক সত্যি।এটাও রিযিক।তবে এটা রিযিকের সর্বনিম্ন স্তর।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তার বান্দাদেরকে রিযিক এক ধাপে পাঠান না বরং কয়েকটি ধাপে দিয়ে থাকেন।
তিনি বান্দার অবস্থা,চেষ্টা, তাকওয়া ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে রিযিক দেন।
এভাবে স্তরবিন্যাস করলে রিযিককে **চারটি** স্তরে ভাগ করা যায়---

১। রিযিকের সর্বনিম্ন স্তর :

রিযিকের সর্বনিম্ন স্তর অর্থ সম্পদ।
কিন্তু এই অর্থ সম্পদ উপার্জনই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের যোগ্যতা, সততা, ধার্মিকতা সবই মলিন যদি অর্থ না থাকে। অর্থ সম্পদের জন্য মানুষ মিথ্যা, প্রতারণা, শঠতা আরো কত কিছুরই আশ্রয় নেয়।

২। রিযিকের সর্বোচ্চ স্তর :

রিযিকের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে শারীরিক ও মানুষিক সুস্থতা। কারনটা একটু ভাবলেই বুঝতে পারি।আমাদের স্বাস্থ্য যদি ভালো না থাকে মানসিকভাবে যদি আমরা যোগ্য না হই,পৃথিবীর সব নিয়ামত আমার পায়ের সামনে হাজির করলেও কিছুই উপভোগ করতে পারবো না।সবই বিষাদ হয়ে যায়। এর জন্য এটা সব চাইতে বড় রিযিক।তবে আমরা নেয়ামতকে গুরুত্ব দেই না।কিন্তু,যখন আমরা অসুস্থতায় পতিত হই তখন ঠিকই এই নেয়ামতের মূল্য বুঝি।

৩।রিযিকের সর্বোত্তম স্তর :

রিযিকের সর্বোত্তম স্তর হচ্ছে উত্তম জীবনসঙ্গী এবং পুণ্যবান নেককার সন্তান।
জীবনসঙ্গী যদি আল্লাহ ওয়ালা হয় ,সে যদি ভালো হয় আর সন্তানটা যদি পরিশুদ্ধ হয় তাহলে দুনিয়াতে থেকে ঘরটাতেই জান্নাতের স্বাদ পাওয়া যায়।

৪।রিযিক এর পরিপূর্ণ স্তর :

রিযিকের পরিপূর্ণ স্তর হচ্ছে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সন্তুষ্টি।রিযিকের এটা যে পায় তার আর কিছুই লাগে না।
দুনিয়ার লোভনীয় বস্তুর প্রতি তার কোনো আকর্ষণ কাজ করে না।
তার হৃদয়ে আত্মিক শান্তি এবং মানসিক প্রশান্তি চলে আসে।দুশ্চিন্তা কমে হৃদয় থাকে শান্ত।সুখ ও তৃপ্তি আসে তার দৈনন্দিন জীবনে।

অন্যভাবেও রিযিকের স্তর আলাদা করা যায়---

১।প্রথম স্তর: মাফরূজ রিযিক (বাধ্যতামূলক বা নির্ধারিত রিযিক)

এটি সেই রিযিক, যা জন্মের আগেই আল্লাহ লাওহে মাহফুজে লিখে দেন।
কেউ চেষ্টা করুক বা না করুক এই অংশ সে পাবেই।
এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে —

- জন্ম-মৃত্যু
- মূল খাদ্য
- ন্যূনতম জীবনধারণের ব্যবস্থা

এটি কখনো কমে–বাড়ে না।

২।দ্বিতীয় স্তর: মওয়াঈদ রিযিক (প্রতিশ্রুত রিযিক)

এটি সেই রিযিক, যা চেষ্টা এবং উপযুক্ত কাজে বের হওয়ার মাধ্যমে আসে।
মানুষ যত বেশি পরিশ্রম করবে, আল্লাহ তত বেশি দরজা খুলে দেবেন।
এর অন্তর্ভুক্ত হলো-

- কাজ
- ইলম
- দক্ষতা
- প্রচেষ্টা
- সময় ব্যবস্থাপনা

৩।তৃতীয় স্তর: মুবাররাক রিযিক (বরকতময় রিযিক)

এটি রিযিকের সর্বোচ্চ সুন্দর স্তর।
এটি পরিমাণে কম থাকলেও এই রিযিকে শান্তি, তৃপ্তি, সুস্বাস্থ্য, সাফল্য ও কল্যাণ থাকে।
এতে বরকত আসে—

- তাকওয়া
- দান-সদকা
- সত্যবাদিতা
- হারাম থেকে বাঁচা
- সৎ কাজ

এ রিযিক মানুষের জীবনে অত্যন্ত মূল্যবান।
আল্লাহ তাআ'লা বলেন,
۞

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،ً
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ-ُ

"আর যে আল্লাহর প্রতি ভীরু ও তৎপর থাকে, আল্লাহ তার জন্য পথ বের করবেন এবং এমন জায়গা থেকে রিজিক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।"

[সূরা ত্বলাক্ব,৬৫:২-৩]

৪।চতুর্থ স্তর: মাফতুহ রিযিক (অপ্রত্যাশিত রিযিক)

এটি হলো সেই রিযিক, যা মানুষের হিসাবের বাইরে আসে—

- হঠাৎ সুযোগ পাওয়া
- অচেনা জায়গা থেকে সাহায্য
- অপ্রত্যাশিত লাভ
- আল্লাহর বিশেষ দয়া

কোরআনে বলা হয়েছে—
"যে তাকওয়া করে, আল্লাহ তাকে অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে রিযিক দেন।"

আমাদের করণীয় হলো আল্লাহর আমাদের প্রতি দয়া দেখিয়ে যে নেয়ামতগুলো দিচ্ছেন ওই নেয়ামতগুলোর সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা।এবং আল্লাহ তাআ'লার নিকট সুকরিয়া আদায় করা।

পরিশেষে বলা যায়,রিযিকের সবচেয়ে সুন্দর সংঙ্গা কখনোই অর্থকড়ির আধিক্য নয়। বরং সর্বোত্তম রিযিক হলো, একটি প্রশান্ত অন্তর যা আল্লাহর সব ফায়সালাতে সন্তুষ্ট। শারিরিক সুস্থতা ও পবিত্র একটি মন। যে মন নেক আমলে সন্তুষ্ট হয়, যে কোন গুনাহের কাজে হয় ব্যথিত।

মায়ের দু'আ এবং বাবার ভালবাসা। নেককার জীবনসঙ্গী ও নেক সন্তান। এবং ঐ সমস্ত মানুষদের প্রিয় হতে পারা, যারা আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং আপনার প্রতি যাদের ভালবাসাও কেবল আল্লাহর জন্যই।
যদি রিযিকের এই বিষয়গুলো আপনার নসিবে জোটে, সর্বোত্তম রিযিকের অধিকারী আপনি।

রিযিকের ফায়সালা হয় আসমানে

কুরআনে আল্লাহ তাআ'লা বহু বার উনার সৃষ্টির কসম করেছেন।যেমন;তীন ফলের কসম,যাইতুনের কসম,পবিত্র ভূমির,সূর্য ও চাঁদের কসম,দিন ও রাতের কসম,আকাশ ও পৃথিবীর আরো অনেক সৃষ্টির কসম আল্লাহ বহুবার করেছেন।
সূরা যারিয়াতে আল্লাহ তাআ'লা আকাশ ও স্বীয় মহা সত্তার কসম করে বান্দার রিযিকের আলোচনা করেছেন।
সূরা যারিয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

وَفِى السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ-
فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ
تَنْطِقُوْنَ -

—"আসমানেই আছে তোমাদের রিযক এবং তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তাও। সুতরাং আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয়ই এটা সত্য, যেমন (সত্য) তোমাদের কথা বলাটা।"

[সূরা যারিয়াত:২২-২৩]

আল্লাহর বাণী অবশ্যই সত্য।তবুও নিজ সত্তার ওপর কসম করেছেন গুরুত্বারোপ করার জন্য।মহান আল্লাহর বাণী অতঃপর সেটাকে শপথ ও উপমা দিয়ে দৃঢ় করার পরও আমাদের সমাজে এমন মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে,যে সংশয়ে ভোগে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই রিযিকদাতা কি না!
মানুষ পড়াশোনা করে, ব্যবসা করে, চাকরি করে।বেশিরভাগ মানুষেরই ভাবনা ব্যবসা বা চাকরি থেকেই সে তার রিযিক পায়।
কিন্তু,এগুলো আসলে রিযিক না।রিযিক পাওয়ার মাধ্যম মাত্র,আর কিছুই না।আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত সৃষ্টির রিজিকের ব্যবস্থা করেন।খাদ্য, সম্পদ বা অন্য যেকোনো জীবন-উপকরণের মাধ্যমে হতে পারে।

সকল প্রাণির রিযিকদাতা একমাত্র ওই সত্ত্বা-ই যার কোনো শরীক নেই।তিনিই **আর-রজ্জাক।**

তিনি দুনিয়া সৃষ্টির আগেই সকল সৃষ্টির রিযিক লিখে রেখেছেন আসমানে **লাওহে মাহফুজে**।

রিযিকের মূল ফয়সালা লাওহে মাহফুজে লেখা—যা আসমানে সংরক্ষিত আল্লাহর বিশাল কিতাব।

কুরআনে আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

"আমরা প্রতিটি বিষয়কে লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছি।"

[সূরা হাদিদ,৫৭:২২]

রিযিক আবার লিখে দেয়া হয় মানুষ যখন মায়ের গর্ভে মাত্র ১২০ দিনের হয়। তখন আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে পাঠান।
ফেরেশতা চারটি বিষয় লিখে দেন।
> তার রিযিক
>তার আয়ু
>তার কর্ম
>সে সুখী না দুঃখী

আল্লাহ তাআ'লা যত জীবসৃষ্টি করেছেন,মানুষ হোক বা প্রাণী,আল্লাহ সবার রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।
তবে কতক মানুষের রিযিক রেখেছেন অফিসের চেয়ারে।সে আয়েশ করে বসে থাকে।হাতে কলমটা আলতো করে ধরে রাখে আর কাগজের পিঠে কিছু আচঁড় কাটে।
কতকের রিযিক রেখেছেন উনুনের সামনে আর কারোটা বরফের কারখানায়।ওই ব্যক্তি সর্বদা আগুনের প্রচণ্ড উষ্ণতায় পুড়ছে আর এই ব্যক্তি সর্বদা বরফের তীব্র শীতলতায় কাতরাচ্ছে।
কারো রিযিক রেখেছেন মক্তবে ছোট্ট বাচ্চাদের সাথে বা কারখানার বড় বড় শ্রমিকদের সাথে।একজন বাচ্চাদের শিক্ষাদানে জীবন উপভোগ করছে আর অন্যজন সহকর্মীদের সাথে পেরে উঠতে হিমশিম খাচ্ছে।
কারোটা সমুদ্রের গভীর তলদেশে ডুব দিয়ে যা সে উদ্ধার করে বা আকাশের সু-উচ্চ সীমানায়,রকেট চড়ে যা সে ছিনিয়ে আনে,কারোটা শক্ত প্রস্তর খন্ডে যা ভেঙ্গে সে তা বের করে,কারোটা ভূপৃষ্ঠের গভীরে,যার সন্ধান পেতে সে খনিতে অবতরণ করে।

মোট কথা, মাধ্যম প্রচুর,রাস্তাও অনেক।যার রুচি যেটাকে গ্রহণ করেছে,আল্লাহ তাকে সেভাবে রিযিক সরবরাহ করেছেন।প্রত্যেকে যখন নিজের থেকে কঠিন কাজে রত ব্যক্তিকে দেখবে তখন নিজেকে আরামে দেখতে পাবে।আমরা প্রত্যেকেই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

আমরা প্রতিনিয়ত শুনে থাকি যে;কেউ বলছে,অমুকে আমার রিযিক মেরে দিয়েছে।অথচ বাস্তবে কেউ কারো রিযিক নিতে পারে না। তেমনি অন্য কারো রিযিক ও কেউ তোমার কাছে পৌঁছাতে পারে না। তোমার জন্য যেটা বরাদ্দ সেটা তোমার দূর্বল অবস্থায়ও তোমার কাছে আসবে। কিন্তু যেটা অন্যের,শক্তি দ্বারা কখনো তুমি তার নাগাল পাবে না।

"কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে,কাগজ শুকিয়ে গেছে।"

— তিরমিজি, আহমাদ, সহিহ হাদিস

(কিছু অংশ রিযিক বন্টিত চাই সুষ্ঠ কর্ম- বই থেকে)

মানুষ জন্মানোর আগেই তার রিযিক লাওহে মাহফুজে লেখা থাকে।গর্ভে ফেরেশতা এসে আবার রিযিক, আয়ু ও আমল লিখে দিয়ে যান।

কুরআনে বলা হয়েছে—‘তোমাদের রিযিক আসমানে রয়েছে।’

কে কত পাবে, কোথা থেকে পাবে—সব আল্লাহ আগেই বণ্টন করে রেখেছেন।মানুষ শুধু উপায় ব্যবহার করে, কিন্তু রিযিকের দাতা ও নির্ধারক একমাত্র আল্লাহ তাআ'লাই।

রিযিক কি নির্ধারিত

ইসলামি আকিদা অনুযায়ী রিযিক আল্লাহ্ তাআ'লার পক্ষ থেকে নির্ধারিত।অর্থাৎ, মোট রিযিক কতো হবে, কবে পাবেন, কোন পথে আসবে—সবই আল্লাহ্ জানেন ও লিখে রেখেছেন।

পৃথিবীর প্রতিটি জীব একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়ে আসে।
মানুষ জন্মানোর পর কেউ ধনী হয়, কেউ গরিব।কেউ অনেক সুযোগ পায়, কেউ কম পায়।
এগুলো শুধু চেষ্টা বা কৌশলের ফল নয় বরং প্রত্যেক মানুষ আলাদা ভাগ নিয়ে আসে।

কেউ খুব চেষ্টা করেও অল্প পায়,
আবার কেউ সামান্য চেষ্টা করেও অনেক পায়।
এতে এটা প্রমাণ করে যে,রিযিক শুধু শ্রমের গণিত নয়।
এর পেছনে একটি পূর্বনির্ধারিত বণ্টন আছে।

__রিযিক মানুষের নিয়ন্ত্রণে নেই।
যদি রিযিক সম্পূর্ণ মানুষের হাতে হতো তাহলে,সবাই ধনী হতে পারত।
কিন্তু,পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো এমন হয়নি।

যদি রিযিক পুরোপুরি মানুষের হাতে হতো—
তাহলে পৃথিবীতে কেউ দুঃখ বা গরীব থাকতো না।সবাই যা চাইত তা-ই পেত।তখন দুনিয়ার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ত।

কিন্তু বাস্তবে—
দুনিয়া ভারসাম্য বজায় রেখে চলছে।কারণ রিযিক একটি উচ্চ জ্ঞানের ভিত্তিতেমল বণ্টিত।

দেখা যায়,কারো প্রচুর কাজ কিন্তু,রিযিক কম।
কারো কাজ কম আবার রিযিক বেশি।

এটি থেকে বুঝায় যে, রিযিক শুধু

চেষ্টা = পরিমাণ,এই সূত্রে হয় না।

মানুষের চাওয়া ও প্রাপ্তিও কখনো এক হয় না।মানুষ অনেক পরিকল্পনা করে।
ব্যবসা করবে, চাকরি করবে, টাকা জমাবে।
কিন্তু বাস্তবে সব পরিকল্পনা পূর্ণ হয় না।কারণ বাস্তব জীবনে—

- মানুষ যা চাইলো তা সব পাওয়া যায় না
- যা পেলো তা অনেক সময় সে ভাবেনি
- অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকেও রিযিক আসে
- আবার প্রত্যাশিত অনেক কিছুই কখনো পাওয়া যায় না

এ থেকে বোঝা যায় যে,**রিযিক আগেই ঠিক থাকে।**
রিযিক মাধ্যম দিয়ে আসে, কিন্তু মালিকানা আগেই ঠিক থাকে।যেমন,
মানুষ চাকরি করে।চাকরির মাধ্যমে রিযিক আসে।
মানুষ ব্যবসা করে।ব্যবসার মাধ্যমে রিযিক আসে।

কিন্তু,
চাকরি থাকলেও সবার রিযিক সমান হয় না।
একই ব্যবসায় কেউ সফল, কেউ ব্যর্থ।
দেখা যায়,একই সুযোগ নিয়ে দুজন মানুষের রিযিক আলাদা হয়।

রিযিক অনেক গভীর একটি বিষয়।
আমি পুরো জীবনে কত টাকা আয় করবো সেটা লিখতো,আমি কবে কোথায় মারা যাবো সেটা লিখতো।আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, আমি কতগুলো দানা ভাত দুনিয়াতে খেয়ে মারা যাবো সেটা লিখিতো।একটি দানাও কম না ,একটি দানাও বেশি না। ধরেন,এটা লিখত যে আমি সারা জীবনে ১কোটি টাকা আয় করবো।এই সিদ্ধান্ত আল্লাহ তাআ'লা নিয়েছেন।আমি হালাল উপায়ে আয় করবো না হারাম উপায়ে আয় করবো সেই সিদ্ধান্ত আমার।

নবী করিম ﷺ বলেছেন,
"কোন ব্যক্তি যদি অভাবী হয় এবং তার অভাবের কথা মানুষের কাছে পেশ করে, তবে তার অভাব দূর হবে না।আর যে ব্যাক্তি তা আল্লাহ ততআ'লার কাছে পেশ করে অনতিবিলম্বে আল্লাহ তাআ'লা নিজ অনুগ্রহে থাকে অভাবমুক্ত করে দিবেন।”

—[আবু দাউদ]

রিযিকে যদি থাকে এক কোটি টাকা উপার্জন করব সারাজীবনে এবং যদি ধৈর্য্য ধারণ করি, আল্লাহ তাআ'লার কাছে চাই।তাহলে হালাল উপায়ে ওই এককোটি টাকা আয় করেই আমি মারা যাবো।হারাম উপায়ে হলেও ওই এককোটি টাকাই।না কম না বেশি।

আমি যেই ফলটি আজকে ঢাকায় বসে খাচ্ছি সেটা হয়তো ইতালি কিংবা থাইল্যান্ড থেকে আমদানি করা।ওই গাছে যখন মুকুল হয়েছে তখনি এটা নির্ধারিত যে সেটা আমার কাছে পৌঁছাবে। এর মধ্যে কত পাখি ওই ফলের উপর বসেছে কত মানুষ ওই ফলটি পাড়তে গেছে,দোকানে অনেকে এই ফলটি নেড়েচেড়ে রেখে গেছে পছন্দ হয় নি।
এইসব ঘটনার একটাই কারন,ফলটি আমার রিযিকে লিখিত। যতক্ষণ না আমি কিনতে যাচ্ছি ততক্ষণ সেটা ওখানেই থাকবে। এর মধ্যে আমি মারা যেতে পারতাম অন্য কোথাও চলে যেতে পারতাম। কিন্তু না,রিজিকে যেহেতু লিখিত আমি এই ফলটি না খেয়ে মারা যাবো না।
রিযিক জিনিসটা এতটাই শক্তিশালী।যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা রাখে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।
আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন,

وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحۡمِلُ رِزۡقَهَا ٱللَّهُ يَرۡزُقُهَا وَإِيَّاكُمۡۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ

—"এমন কত জীবজন্তু আছে, যারা নিজেদের খাদ্য সঙ্গে বয়ে বেড়ায় না। আল্লাহই তাদেরকে রিযক দান করেন এবং তোমাদেরকেও। তিনিই সব কথা শোনেন, সকল কিছু জানেন।"
[সূরা আনকাবুত,২৯:৬০]

কোথা থেকে কার রিযিক কিভাবে আসবে অথবা কার রিযিক কোথায় লেখা তা আমরা কেউ জানি না।ধরুন, যেই আত্মীয় কিংবা বন্ধু বান্ধব আমার বাসায় আসছে সে আসলে আমার খাবার খাচ্ছে না। এটা তার রিযিক।
আল্লাহ তাআ'লা শুধু মাত্র আমার মাধ্যমে তার কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। কেউ আসলে আমরা কারোটা খাচ্ছি না ,যে যার রিজিকের ভাগই খাচ্ছি।

একবার শায়েখ সাদেক মুজাদ্দেদি (রহ.) একটি ঘটনা শুনিয়েছেন।যিনি আফগানিস্তানের শীর্ষ আলেমদের অন্যতম এবং মিশরের রাজতন্ত্রের যুগে দীর্ঘ দিন কূটনৈতিক মন্ত্রনালয়ের প্রধান ছিলেন।
একদিন সরকারি মিশন নিয়ে রাশিয়া সফরে আদেশপ্রাপ্ত হলেন।তখন তিনি মনে মনে একটা বিষয়ে শঙ্কিত হচ্ছিলেন যে, ওখানেতো মুসলমানদের জবাইকৃত পশুর গোস্ত পাওয়া যাবে

না।আর মুসলমানের জন্য কোনো পরকালের অবিশ্বাসী কমিউনিষ্টের জবাইকৃত পশুর গোস্ত খাওয়া জায়েজ নেই।
তাই তিনি তার বাড়িতে পোষা দুটো মুরগী জবাই করে দিলেন।তার বিবি সাহেবা সুন্দর করে রান্না করে দিলেন।শায়েখ এগুলো সফরে আহারের উদ্দেশ্যে সাথে নিলেন।

অতঃপর রাশিয়া পৌঁছালেন।তো কাকতালীয় ভাবে শহরে কিছু মুসলমান পেয়ে গেলেন।তাদের এক বয়োবৃদ্ধ দ্বীনদার ব্যক্তি শায়খকে দুপুরের খাবারের দাওয়াত দিলেন।তখন তিনি সাথে রাখা মুরগী দুটো নিয়ে যেতে সংকোচবোধ করছিলেন।ইতিমধ্যে পথে একটি দরিদ্র মুসলিম পরিবার পেয়ে মুরগী দুটো তাদের দিয়ে দিলেন। তিনি ওখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেই টেলিগ্রাম এসে পৌঁছালো যে,
'মিশন ভেস্তে গেছে আপনাদের আফগানিস্তান ফিরে যেতে হবে।'

তাহলে প্রকৃত পক্ষে তার এই ঝটিকা সফর,দু-হাজার কিলোমিটার অতিক্রম এবং এ কষ্ট অর্জন শুধু এজন্যই যে, তার বাড়িতে পোষা এবং স্ত্রীর রেঁধে দেওয়া মুরগী দুটো তার রিযিকে ছিলো না।বরং কমিউনিস্টদের হাতে আক্রান্ত দূরদেশে এই মুসলিম পরিবারের রিযিক ছিলো। সুতরাং রিযিকের মালিক আল্লাহ, যাকে যেভাবে চান তার কাছেই রিযিক পৌঁছে দেন।

—শায়েখ আলী তানতাবী রাহ.

ঘটনা থেকে সহজেই বুঝতে পারি,
আপনার রিযিক যেখানেই থাকুক না কেন,আল্লাহ্ সেখান থেকেই আপনার সামনে এনে হাজির করবেন।
কেউ কারো রিযিক খেতে পারবে না বা নিতে পারে না।
যেই পরিবারে জন্মেছেন, যেই দেশ, পরিবেশ, সময় পেয়েছেন,যেসব সুযোগ এসেছে,যেসব মানুষ জীবনে এসেছে এসবই আপনার রিযিকের অংশ।
এগুলো কাউকে দিয়ে বদলানো যায় না।বা অন্যেরটা আনাও যাবে না।

তাই বুঝা যায়,**মানুষের রিযিক**
নিজস্ব, নির্দিষ্ট এবং আগেই ঠিক করা নির্ধারিত।

তাক্বদীর ও রিযিক

তাক্বদীর হলো আল্লাহ্ আগেই সব কিছু জেনে এবং তাঁর হিকমত অনুযায়ী যা কিছু ঘটবে তা নির্ধারণ করে রেখেছেন।
যেমন;মানুষের আয়ু,কর্ম,বিয়ে,সুখ–দুঃখ,রিযিক,মৃত্যু...... জীবনের সব ঘটনা।

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো,তাক্বদীর মানে মানুষের কোনো ইচ্ছাশক্তি নেই এমন না। মানুষকে ইচ্ছা-বিবেক দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া রয়েছে।তাই সে ভালো–খারাপ যেটি বেছে নেয়, সেটির পূর্ণ দায়ভার তার নিজের।

তাক্বদীরের বিষয়ে রাসূল ﷺ বলেছেন,

"সবকিছুই কলম দ্বারা লেখা হয়েছে।"

[তিরমিজি ২১৫৫,আবূ দাউদ ৪৭০০]

অর্থাৎ,আল্লাহর জ্ঞান ও লাওহে মাহফুজে সব লেখাই আছে।

অন্যদিকে,
রিযিক হলো যা কিছু আমাদের জীবনে উপকার আনে সবই রিযিক।

রিযিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ্। তিনিই সবার রিযিক নির্ধারণ করেন।এবং কেউ কারো রিযিক খেয়ে নিতে পারে না।

কুরআনে বলা হয়েছে,

۞وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ
"ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোনও প্রাণী নেই, যার রিযক আল্লাহ নিজ দায়িত্বে রাখেননি। তিনি তাদের স্থায়ী ঠিকানাও জানেন এবং সাময়িক ঠিকানাও। সব কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।"

[সূরা হুদ,১১:৬]

রিযিক হচ্ছে তাক্বদীরের একটি অংশ।

রিযিক নির্ধারিত কিন্তু তা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা তাক্বদীরেরই অংশ।
অর্থাৎ,আল্লাহ্ মানুষের তাক্বদীরে আগেই তার রিযিক লিখে রেখেছেন।
মানুষের জীবনে যত রিযিক আসবে হালাল-হারাম, কম-বেশি, সুযোগ-সম্ভাবনা সবই তাক্বদীরের মধ্যে পড়ে।

অনেকে ভুলভাবে মনে করেন যেহেতু রিযিক লেখা, তাই চেষ্টা না করলেও আসবে।
আসলে চেষ্টা করাও তাক্বদীরের উপকরণ।
উদাহরণসরূপ,
পাখির রিযিক নির্ধারিত।কিন্তু পাখি সকালেই বাসা ছেড়ে বের হয়।
যে চেষ্টা করবে, আল্লাহ তার জন্য রিযিকের দরজা খুলে দেবেন।রিযিক নির্ধারণের সঙ্গে এই নিয়মও তাক্বদীরের মধ্যেই রয়েছে।
আল্লাহ্ তাআ'লা যাকে ইচ্ছা,যতটুকু ইচ্ছা,যতক্ষণ সময়ের জন্য ইচ্ছা করেন সম্পদ দান করেন।আবার যখন ইচ্ছা তার থেকে নিয়ে নেন।তাই তিনি যাকে প্রাচুর্য দান করেন,নিশ্চয়ই তার পিছনে কোনো হেকমত নিহিত রয়েছে।আর যাকে দারিদ্র্যতা দেন তার পিছনেও কোনো হেকমত রয়েছে।আল্লাহ্ হোলাম হিসেবে আমাদের করণীয় হলো তার বন্টনের উপর খুশি থাকা এবং অবস্থা তরান্বিত করার জন্য কর্মের মাধ্যমে চেষ্টা করা।আল্লাহ্ তাআ'লা সুস্পষ্ট ভাবেই বলেছেন,

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝

“আর মানুষ তা-ই পায়,যা সে চেষ্টা করে কামাই করে।”

[সূরা নাজম,৫৩:৩৯]

আল্লাহ্ জানেন মানুষের চলার পথ শুরু ও শেষ কোথায়।
আল্লাহই রিজিকের মূল উৎস।কিন্তু এর মানে এই নয় যে, মানুষকে চেষ্টা না করে বসে থাকতে হবে। বরং, চেষ্টা করার পাশাপাশি আল্লাহর ওপর ভরসা করাই হলো আসল তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা)।রিযিকের জন্য শুধু বসে না থেকে কর্মের মাধ্যমে প্রচেষ্টা ও আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল থাকা জরুরি।

নিশ্চয়ই রিযিক বন্টিত আর কর্ম **ওয়াজিব**।আর উপকরণ ত্যাগ করে তাওয়াক্কুল হয় না।আল্লাহই রিজিকদাতা আর তিনিই বাঁধাদানকারী।

তাই বলা যায়,

কাজ+তাওয়াক্কুল+সবর=প্রকৃত সফলতা।

হালাল ও হারাম রিযিক

যে রিযিক আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ﷺ এর দেখানো পথে থেকে অর্জন করা হয়,সেই রিযিকই **হালাল রিযিক।**

সৎ উপায়ে চাকরি,বৈধ ব্যবসা,কৃষি, শ্রম, দক্ষতা,বৈধভাবে ক্রয়-বিক্রয়,উপহার বা দান যা হালাল উৎস থেকে এসেছে,উত্তরাধিকার থেকে পাওয়া রিযিক।

হালাল রিযিক জীবনে শান্তি, বরকত, নূর এবং দোয়া কবুল হওয়ার মাধ্যম।

নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন,

"হালাল রিযিক অনুসন্ধান করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরজ।"

[আল-বায়হাকি:১৬৩৩]

আর,

যে রিযিক আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ﷺ নিষিদ্ধ করেছেন বা ইসলামি শরীয়াতের বিরোধী পথে আসে, তা **হারাম রিযিক** বলে গণ্য।

সুদ-ঘুষ থেকে আয়,চুরি, ডাকাতি,জালিয়াতি,প্রতারণা,মদ, জুয়া, হারাম ব্যবসা,কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করা,মিথ্যা বলে লাভ নেওয়া,পরিমাপে কম দেওয়া, বাজারে প্রতারণা সবই হারাম রিযিকের অন্তর্ভুক্ত।

হারাম রিযিক মানুষের জীবনে অশান্তি, সংকট, দু'আ কবুল না হওয়া এবং গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন,

"হারাম খাদ্য গ্রহণকারী বান্দার দু'আ আল্লাহ কবুল করেন না।"

[সহীহ মুসলিম]

ইসলামে হালাল উপার্জনকে শুধু জীবিকা নয় বরং ঈমানের একটি অংশ ধরা হয়েছে। হালাল পথে উপার্জন মানে এমন কাজে যুক্ত থাকা যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ অনুমোদন

করেছেন;যেখানে প্রতারণা নেই, মিথ্যা নেই, মানুষের ক্ষতি নেই এবং লেনদেনে স্বচ্ছতা রয়েছে।
বৈধ ব্যবসা, সৎ চাকরি, শ্রম, কৃষি, শিল্প এমন যে কোনো কাজই হালাল।
যদি তা নিষিদ্ধ কোনো জিনিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হয়।
হালাল রিযিক মানুষের জীবনে বরকত আনে।হারাম থেকে রক্ষা করে এবং দু'আ কবুল হওয়ার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।

হারাম রিযিক সেই আয় যা আল্লাহ স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছেন।
হারাম আয় মানুষের অন্তর কঠিন করে, জীবনে অশান্তি আনে, দু'আ কবুল হওয়া বন্ধ করে দেয় এবং পরিবারের ওপরও খারাপ প্রভাব ফেলে।

হারাম আয় থেকে বাঁচার মূল উপায় হলো,নিজের উপার্জনের উৎসকে সর্বদা পরিষ্কার রাখা। যে কাজটি হারাম বলে সন্দেহ হয়, সেটি এড়িয়ে চলা।

কারণ নবী ﷺ বলেছেন,
“হালাল স্পষ্ট, হারাম স্পষ্ট; আর এ দুটির মাঝে কিছু সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে। যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় ত্যাগ করে, সে তার দ্বীন ও মানসম্মানকে রক্ষা করে।”

[সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

কাজ বেছে নেওয়ার সময় শুধু বেতন বা লাভ নয়।প্রথমে দেখতে হবে পথটি হালাল কিনা। সুদের লেনদেন ও ঘুষের মতো স্পষ্ট হারাম বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকা জরুরি। মিথ্যা বলা, কম মাপা, প্রতারণা এগুলো সামান্য মনে হলেও এগুলো আয়কে হারাম ও বরকতবিহীন করে দেয়।

হালাল রিযিকের ওপর ভরসা রাখা আসলে আল্লাহর ওপর **তাওয়াক্কুলেরই অংশ**। মানুষ যদি আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে, হারাম এড়িয়ে চলে এবং হালাল পথে চেষ্টা করে তাহলে আল্লাহ তাকেই রিযিকের দরজা খুলে দেন।
হারাম ছাড়ার জন্য সাহস দরকার।
আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যে হারাম ত্যাগ করে, তিনি তার জন্য হালালের ভালো দরজা তৈরি করে দেন।

—বর্তমানে মানুষ রিযিক অনুসন্ধান করার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়।

অমুকের কাছে তমুকের কাছে মাথানত করে।অথচ মহান রব্বুল আলামিন কোথায় রিযিক অনুসন্ধান করার কথা বলেছেন সেটার দিকে লক্ষ্য করে না।

পবিত্র কুরআনুল কারিম এমন একটি কিতাব যেখানে সমস্ত কিছুর সমাধান রয়েছে।

এমনকি,রিযিক কোথায় অনুসন্ধান করবে সে ব্যাপারেও মহান আল্লাহ তাআ'লা জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর বাণীতে—

رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

সুতরাং আল্লাহর কাছে রিযক সন্ধান কর, তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় কর। তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

[সূরা আনকাবুত,২৯:১৭]

আজ আমরা কৃষি কাজ কিংবা ব্যবসা বানিজ্যে রিযিকের অনুসন্ধান করতে গিয়ে নামাজের আদেশ লঙ্ঘন করছি।অথচ এই নামাজেই রয়েছে রিজিকের ফয়সালা। উল্লেখিত আয়াতে রিযিক সমস্যা সমাধানে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। কোটি মানুষ চেষ্টা করেও এক ফোঁটা পানি বানাতে পারবেনা। বানাতে পারবেনা একটি শস্যও।

তাই রিজিকের একমাত্র মালিক আল্লাহ তাআ'লার ওপরই তাওয়াক্কুল করতে হবে।সব ধরনের রিজিকের জন্য তার মহান দরবারেই সবর ও সালাতের মাধ্যমে আমাদের রিযিক প্রার্থনা করতে হবে।

আল্লাহ্ মানুষের জীবিকা বা রিজিকের মালিক। এমনকি তার নিকটেই সমস্ত কিছুর ভান্ডার। কিন্তু জীবন জীবিকার তাগিদে মানুষ ছুটে বেড়ায় দিকদিগন্তে।

রিজিকের চিন্তায় তার বিবেক-বুদ্ধি সদা থাকে ব্যস্ত। অর্থনৈতিক উত্থান-পতনে দিশেহারা হয় মানুষ। অথচ যার নিকট সমস্ত কিছুর ভান্ডার তার নিকট কেউ আসে না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۝
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم۝
وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِين۝
وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُون۝

—আর তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি তোমাদের জন্য এবং তাদের (অর্থাৎ সেই সকল মাখলুকের) জন্যও যাদের রিযক তোমরা দাও না।

আর তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি তোমাদের জন্য এবং তাদের (অর্থাৎ সেই সকল মাখলুকের) জন্যও যাদের রিযক তোমরা দাও না।

এবং এমন কোন (প্রয়োজনীয়) বস্তু নেই, যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই, কিন্তু আমি তা অবতীর্ণ করি সুনির্দিষ্ট পরিমাণেই।

এবং পাঠিয়েছি সেই বায়ু, যা মেঘমালাকে করে পানিপূর্ণ, তারপর আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, তারপর আমি তা দ্বারা তোমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করি। তোমাদের সাধ্য নেই যে, তা সঞ্চয় করে রাখবে।

[সূরা হিজর,১৫:২০-২৩]

সুতরাং আজকে থেকে সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহ্ রব্বুল আ'লামিনের শরণাপন্ন হবো।

এমকি যা কিছু দরকার সমস্ত কিছুর ভান্ডারের মালিক মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে প্রার্থনা করবো।

(হে রিজিক অন্বেষণকারী তোমাকে বলছি-বইয়ের কিছু অংশ থেকে)

রিযিকের পরিমাণ কি বাড়ে-কমে?

ইসলামি দৃষ্টিতে রিযিক বাড়ে-কমে।যার ফলে,শুধু আয়ের মধ্যে নয় বরং মানুষের পুরো জীবনযাত্রার অবস্থা এতে প্রভাবিত হয়। কুরআন হাদিসের আলোকে রিযিক বাড়া-কমার কিছু কারণও আছে।

রিযিক বাড়া মানে শুধু বেশি টাকা নয়।বরং কম আয়েও সুখ পাওয়া,অযথা খরচ বন্ধ হওয়া,রোগ-ব্যাধি কমা,সমস্যার সমাধান পাওয়া,জীবনে সহজ পথ খুলে যাওয়া,প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিস সহজে পেয়ে যাওয়া,অপ্রত্যাশিত ভালো সুযোগ আসা
এসবই **রিযিক বৃদ্ধি** পাওয়া।
সঠিক সময়ে সঠিক মানুষের সাথে পরিচয় হওয়া এটাও রিযিক বাড়া।পরিবারে শান্তি, সন্তান নেক কাজে আগ্রহী হওয়া এগুলো **রিযিকের বড় নিয়ামত।**

আর **রিযিক হ্রাস** মানে আয় কমে যাওয়া নয়।বরং সবকিছুতে বরকত কমে যাওয়া,কষ্ট বাড়া,টাকা থাকলেও শান্তি না থাকা,রোগ-ব্যাধি লেগে থাকা।হঠাৎ হঠাৎ অপ্রয়োজনীয় ছোট - বড় ক্ষতি হওয়া,টাকা থাকা সত্ত্বেও টানাটানি থাকা এটাই রিযিক কমে যাওয়া।
এক্ষেত্রে দেখা যায়,টাকা থাকে-কিন্তু সুখ থাকে না।পরিবারে অশান্তি বেড়ে যাওয়া,ঝামেলা বেড়ে যাওয়া,জীবনে ভয় ও অস্থিরতা বেড়ে যাওয়া এগুলোও রিযিক কমার লক্ষণ।

বান্দার রিযিক বাড়ানো বা কমানো সম্পূর্ণটা আল্লাহর হিকমত।আল্লাহ যখন ইচ্ছা বান্দাকে রিযিক বাড়িয়ে দেন আর যখন ইচ্ছা বান্দাকে রিযিক কমিয়ে দেন।

আল্লাহ তাআ'লা নিজ বান্দাদের মূলতঃ পরিক্ষার জন্য রিযিক বৃদ্ধি বা হ্রাস করেন।
রিযিক বৃদ্ধি আল্লাহ সন্তুষ্টির প্রমান নয়।অনুরূপ,রিযিকের সংকীর্ণতাও তাঁর অসন্তুষ্টির কারন নয়।অধিকাংশ মানুষ এ বিষয় জানে না।
দুনিয়ার সচ্ছলতা কারো শুভ লক্ষণের দলিল নয়।কেননা আখিরাতের সাফল্য নির্ভর করে নেক আমলের উপর দুনিয়ায় আল্লাহ কখনো অবাধ্যকে দেন সচ্ছলতা অনুগতকে দেন সংকীর্ণতা।আবার কখনো এর বিপরীত করেন।
কখনোও উভয়কেই সচ্ছলতা দেন,কখনো দেন সংকীর্ণতা। কখনো অবাধ্য বা অনুগত ব্যক্তিকে এক সময় দেন সচ্ছলতা, অন্য সময় দেন অসচ্ছলতা। এসব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন আল্লাহ তাআ'লা নিজ প্রজ্ঞা ও হিকমতের ভিত্তিতে। রিযিকের এই হ্রাস বৃদ্ধি পরীক্ষাস্বরূপ।
আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

۞وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِين۞ َ

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব (কখনও) কিছুটা ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনও) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনও) জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। সুসংবাদ শোনাও তাদেরকে, যারা (এরূপ অবস্থায়) সবরের পরিচয় দেয়।

[সূরা বাকারাহ,২:১৫৫]

স্বভাবগতভাবে মানুষের মধ্যে তাড়াহুড়ো করার প্রবণতা আছে।সে দ্রুত সব কিছু পেতে চায়।সব কিছু ভোগ করতে চায়।কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম হলো নির্ধারিত সময়ে ধীরে ধীরে জীবনোপকরণ হাতে আসা।
রিযিক কম বেশি হওয়ার কারন প্রসঙ্গে মহা পরাক্রমশালী দয়াময় প্রভু আরো বলেন,

۞وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَـٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِير۞ ٌ

যদি আল্লাহ্ তাঁর সকল বান্দাকে প্রচুর রিযিক দিতেন,তবে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত।কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সেই পরিমাণ নাজিল করেন।নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদের খবর রাখেন ও সবকিছু দেখেন।

[সূরা শূরা,৪২:২৭]

সুতরাং আমরা উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে জানতে পারলাম,রিজিকের ক্ষমতা কেবল আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কারো হাতে নয়। তাই দুনিয়ায় সে যত বড়ই হোক না কেন, তার কাছে নয় বরং রিযিক আল্লাহর কাছে চাইতে হবে।
বিশ্বাস যেন এমন হয়, রিযিক বৃদ্ধির ক্ষমতা শুধু আল্লাহর। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে সৎ ও আন্তরিক ভাবে কাজ করতে হবে।

এমনকি আল্লাহ্ তাআ'লা উপর পরিপূর্ণ আস্থা ভরসা রাখতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চওয়ার মতো তৌফিক দান করুক।আমিন।

রিযিক কেন হ্রাস পায়

মুফতি সাঈদ আহমাদ পালানপুরি বলেছিলেন,কোন পরিবারের প্রতি মহান আল্লাহর সব চেয়ে বড় নেয়ামত হচ্ছে দু'টি।
ইলম ও ধন- সম্পদ।
দুঃখজনক হলেও সত্যি, বংশ পরম্পরায় এই নেয়ামত দু'টি ধরে রাখতে প্রায় পরিবারই ব্যর্থ। অথচ একটু সচেতনতা একটু সর্তক দৃষ্টিই পারতো যুগ যুগ ধরে পরিবারে মহান আল্লাহ প্রদত্ত এই নেয়ামত ধরে রাখতে। প্রতিটি পরিবারের উচিত তাদের পরিবারে ধন-সম্পদ আসলে তার বরকত ধরে রাখা।আর দুনিয়ার সব চেয়ে কঠিন কাজ এটাই। একটু ভুলেই গুনতে হতে পারে বিরাট মাশুল।
কিছু কারনে রিযিকে বরকত হ্রাস পায়। কয়েকটি কারণ দেয়া হলো—

১।গুনাহ্:

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম তার বিখ্যাত গ্রন্থ আল-জাওয়াবুল কাফী এর মধ্যে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। যার সারমর্ম হচ্ছে---নিশ্চয়ই গুনাহ মানুষের বয়স,রিযিক, জ্ঞান,আমল ও আল্লাহর আনুগত্যের বরকত কমিয়ে দেয়।
এক বাক্যে বললে বলা যায়, গুনাহ্ মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার সকল কিছুর বরকত কমিয়ে দেয়। এই জন্যে যারা মহান আল্লাহর নাফরমানী করে আপনি তাদের জীবনে, দ্বীনে ও দুনিয়ায় সামান্য পরিমান বরকতও দেখতে পাবেন না।আর জমিন থেকে যতটুকু বরকত উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে তা মানুষের গুনাহের কারণে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।
মহান আল্লাহ বলেন,

۞لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا
۞لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْض ِ

"যদি সে সকল জনপদবাসী ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে কল্যাণধারা মুক্ত করে দিতাম।"
[সূরা আরাফ,৭:৯৬]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

َأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۞

"এবং (হে রাসূল! মক্কাবাসীদেরকে বল, আমার প্রতি) এই (ওহীও এসেছে) যে, তারা যদি সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তবে আমি প্রচুর পরিমাণ পানি দ্বারা তাদেরকে সিঞ্চিত করব।"

[সূরা জিন,৭২:১৬]

নিশ্চয়ই মানুষ তার পাপের কারনে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

হাদিসে এসেছে নিশ্চয় জিবরীল আ. আমার অন্তরে ইলহাম করেছেন।কোনো আত্মা ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে না,যতক্ষণ না তার রিযিক সে পূর্ণ করে। অতএব, আল্লাহকে ভয় করো এবং সুন্দরভাবে রিযিক অনুসন্ধান করো।

কেননা,মহান আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা তার আনুগত্য ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়।

মহান আল্লাহ সুখ-শান্তিকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন তাঁর সন্তুষ্টি ও তাঁর আস্থা অর্জনের মধ্যে।যেমন,ইমাম আহমদ তাঁর কিতাবু যুহদে একটি আছার এনেছেন যাতে বলা হয়েছে, আমিই আল্লাহ আমি যখন রাযী থাকি তখন বরকত দিই আর যখন রাগান্বিত হই তখন অভিশাপ দিই। আর আমার অভিশাপ অধস্তন সাত পুরুষ পর্যন্ত ধরে ফেলে। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর অবাধ্যতা জীবন ও রুযি থেকে বরকত কমে যাওয়ার কারণ।

কেননা,যারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করে তাদের দায়িত্ব থাকে শয়তানের উপর। শয়তানই তাদের উপর রাজত্ব করে।

সুতরাং প্রত্যেক যা কিছু শয়তানের সাথে সম্পৃক্ত তাতে বরকত থাকে না।

২।পিতা-মাতার অবাধ্যতা:

পিতা মাতার খেদমতে যেমন রিযিক বাড়ে ঠিক তেমন পিতা মাতার অবাধ্যতায় রিযিক কমে যায়। পিতা মাতাকে কষ্ট দিলে তাদের মুখ থেকে যে উহ্ শব্দ বের হয় তারা মুখ বুঝে তাদের বুকে পাথর চাপা দিয়ে যে কষ্ট লুকিয়ে রাখেন, সেই কষ্ট ও উহ্ শব্দই সরাসরি আরশে পৌঁছে যায়।এমনকি অতি পরহেজগার অতি ইবাদতগুযার হওয়ার পরেও শুধু মাত্র পিতা মাতার অন্তত থেকে বের হওয়া বদদোয়ার কারনে আপনার জীবন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। যার জ্বলন্ত দৃষ্টন্ত বনী ইসরাঈলের জুরাইজের ঘটনা---

জুয়াইরিজ একজন অত্যন্ত পরহেজগার ও ইবাদতকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মানুষের ভিড় ও দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে দূরে থাকতেন এবং ইবাদতের জন্য একটি আলাদা গির্জা তৈরি করে সেখানে বসবাস করতেন। দিনরাত সালাত ও ইবাদতে মগ্ন থাকাই ছিল তার জীবনের মূল কাজ।

একদিন তার মা তাকে ডাকলেন।

জুয়াইরিজ তখন নফল সালাতে ব্যস্ত ছিলেন।
তিনি মনে মনে ভাবলেন,
“আমি কি নামাজ চালিয়ে যাব, নাকি মায়ের ডাকে সাড়া দেব?”
অবশেষে তিনি ইবাদতকে বেছে নিলেন, এবং মায়ের ডাকের উত্তর দিলেন না।
এভাবে তিনবার ঘটলো।
তার মা কষ্ট পেয়ে বদদোয়া করলেন,
“হে আল্লাহ! তাকে মানুষের পরীক্ষায় ফেলো!”

মায়ের দু'আ যেমন আল্লাহ কবুল করেন তেমনি বদ দু'আও কবুল করেন।এবং আল্লাহ্ তার মায়ের দেয়া এই বদ দু'আ কবুল করেলেন।

জুরাইজের ইবাদত, খ্যাতি ও পরহেজগারি দেখে একদল লোকের ঈর্ষা হয়।
লোকেরা তাকে ছোট করতে এবং অপমান করতে চাইল।সে সময় এক নারী ছিল, যার চরিত্র খারাপ ছিল।
মানুষ তাকে বলল,
“তুমি কি জুরাইজকে অপবাদ দিতে পারবে?”
সে বলল,
“হ্যাঁ, আমি তাকে অপমানিত করব!”
সে ব্যভিচার করে গর্ভবতী হলো এবং বলল,
“এই সন্তান জুয়াইরিজের।”

মানুষ অপবাদ বিশ্বাস করে জুয়াইরিজের গির্জা ভেঙে ফেলল এবং তাকে জোরে জোরে গালমন্দ করতে লাগল।

জুয়াইরিজ কিছু বললেন না শুধু বললেন ,
“আমাকে নামাজ পড়তে দাও।”
তিনি নামাজ পড়লেন, তারপর সেই নবজাতক শিশুর দিকে ইশারা করে বললেন,
“হে শিশু, বলো তোমার বাবা কে?”
শিশু অলৌকিকভাবে বলল,
“আমার বাবা অমুক রাখাল।”

আসল সত্য প্রকাশ হয়ে গেল।

মানুষ বুঝল যে তারা জুয়াইরিজের বিরুদ্ধে ভুল করেছে।তখন তারা বলল,
“আমরা তোমার জন্য সোনার গির্জা তৈরি করে দেব।”
জুয়াইরিজ বললেন,
“না, তোমরা আগের মতোই মাটির গির্জাই তৈরি করো।”

[বুখারী ১২০৬,মুসলিম ২৫৫০]

উক্ত ঘটনায় প্রমাণিত হয়, অতি পরহেজগার হওয়ার পরও মা বাবার বদদু'আ কাজে লেগে যায়।তাই দুনিয়াবী শান্তি সম্মান ও ধন সম্পদে বরকতের জন্য পিতা-মাতা সন্তুষ্টি ও দু'আ-এর কোন বিকল্প নাই।

৩।যিনা :

যে সমস্ত পাপে রিযিক কমে যায় বা রিযিকের বরকত থাকে না তার মধ্যে অন্যতম পাপ হচ্ছে যিনা। যিনা মহা অপরাধ, যা মহান আল্লাহকে রাগান্বিত করে দেয়। মহান আল্লাহর আত্মা মর্যাদায় আঘাত লাগে যখন তার কোন বান্দা/বান্দী যিনায় লিপ্ত হয়।মহান আল্লাহ্ সব চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সত্তা।যিনার ফলে মানুষের হক্ক নষ্ট করা হয়। নবজাতকের হক্ক নষ্ট করা হয়। পরিবার কে ধ্বংস করা হয়।
সমাজকে কলুষিত করা হয়। এই জন্য প্রায় হাদীসেই রাসুল (স:) বড় মহা পাপ গুলোর মধ্যে যিনা কে গণ্য করেছেন।মহান আল্লাহ্ যিনার শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন। এমনকি তিনি বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়কে গযব দিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন যিনা- ব্যভিচারের মহামারীর কারণে।

৪।সুদ:

পৃথিবীতে সম্পদ কমার অন্যতম কারন হচ্ছে সুদ।সুদের কারনে অবশ্যই সম্পদ কমবে।সুদ গ্রহণ করলে ফক্কীর হতেই হবে। আজ হোক অথবা কাল হোক
সুদ গ্রহীতা নিজে ফকির হোক অথবা তার সন্তান সন্ততি বা তার পৌত্র/প্রপৌত্র কোন না কোন এক জেনারেশন সুদের কারনে আল্লাহর গযবে ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে ফক্কীর হতে বাধ্য।
মহান আল্লাহ বলেন,

يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ
وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

"আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-সদাকাকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ এমন প্রতিটি লোককে অপছন্দ করেন যে নাশোকর, পাপিষ্ঠ।"

[সূরা বাকারাহ্,২:২৭৬]

তিনি আরও বলেন,

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ۝ ۖ

"তবুও যদি তোমরা (তা) না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও।"

[সূরা বাকারাহ,২:২৭]

৫।অপচয় :

আপনি অন্য কারও টাকায় জীবন যাপন করেন। ছাত্র মানুষ।স্বভাবতই আপনাকে হিসাব করে চলতে হয়।অপচয় করার কোন সুযোগ থাকে না।কিন্তু নিজের পায়ে দাড়িয়ে টাকা বেশি হলেই কেন অপচয় করা শুরু করেন?

আপনি কি ভুলে যান,আপনার মানিব্যাগে যে টাকা আছে সে টাকা মহান আল্লাহর? আপনার ব্যাংকে যে টাকা আছে সে টাকার মূল মালিক মহান আল্লাহ। তিঁনি আপনাকে দয়া করে দিয়েছেন।এটাও অন্যের দেয়া টাকা।তাই হিসাব করে খরচ করুন।অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় খরচ মহান আল্লাহর ক্রোধের কারণ। কুরআনে আল্লাহ্ বলেন,

۝وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۝
۝إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۝

"আর অপচয় করো না,নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই।"

[সূরা ইসরা,১৭:২৬-২৭]

তিনি আরো বলেন,

۝وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۝
۝إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۝

"এবং খাও ও পান কর, কিন্তু অপব্যয় করো না। আল্লাহ অপব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

[আরাফ,৭:৩১]

৬।নেয়ামতের অবমূল্যায়ন :

আপনি কোন ধনি ব্যক্তিকে আপনার সাধ্য অনুযায়ী কিছু উপহার দিলেন।উপহারটা কম দামী দেখে তিনি তা ফেলে দিলেন। আপনার কেমন লাগবে?
আপনার সন্তানের হাত থেকে একটা চকলেট পড়ে গেলো।আপনি বড়লোকি ভাব দেখিয়ে চকলেটটি উঠালেন না সন্তান উঠাতে গেলোও নিষেধ করলেন।আপনি কি জানেন এই একটা চকলেট কেনারও আপনার ক্ষমতা ছিলো না যদি মহান আল্লাহ না চাইতেন।তাঁর দয়াতে আপনি এই চকলেট টি আপনার সন্তানের জন্য কিনতে পেরেছেন।
দুনিয়াতে এই রকম লাখোও মানুষ আছে যাদের কাছে এই একটি চকলেটই জীবন বাঁচানোর সম্বল হতে পারতো।
সিরিয়া যান! অতদূর যাওয়ার দরকার নাই, ঘরের পাশের রোহিঙ্গাদের কাছে যান।
তাও সাধ্য না হলে ঢাকার ডাস্টবিন ও ফুটপাতগুলোতে দৃষ্টি দিন।আপনাদের ফেলা জিনিস গুলো একদল মানুষ কুকুরের সাথে মিলে অনুসন্ধান করছে।হায়! নেয়ামতের অবমূল্যায়ন করা মূলত অকৃতজ্ঞতা।অকৃতজ্ঞতা এক প্রকার অহংকার।
রাসুল ﷺ বলেন,

"যদি তোমাদের কারও নিকট থেকে লোকমা পড়ে যায় তাহলে সে যেন লোকমাতে লেগে থাকা ময়লা দূর করে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য না ছাড়ে।যখন তোমাদের কেউ খাওয়া থেকে ফারেগ হয় তখন সে যেন আঙুল চেটে খায়,কেননা সে জানে না কোন খাদ্যে বরকত আছে।"

[মুসলিম,২০৩৩]

ভাতের একটা দানা পড়ে গেলেও তা উঠিয়ে নেয়া উচিত। এই একটা দানার পিছনে দুনিয়ার কত মানুষের পরিশ্রম আছে।
প্রতিটি নেয়ামতের মূল্যায়ন করা হলে তবেই নেয়ামতের বরকত থাকে। তাই সচেতন হওয়া জরুরি।

৭।অহংকার :

অহংকার পতনের মূল। অহংকার মহান আল্লাহর চাদর। যে আল্লাহর চাদর নিয়ে ছিনিমিনি খেলে মহান আল্লাহ থাকে বরদাশত্ করেন না।

হযরত মূসা (আ:)-এর যুগে কারূনের কাহিনি মহান আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করেছেন। কারূনের ধনভাণ্ডারের চাবি বহন করার জন্য একদল লোক লাগতো।

সে তার সম্পদের দাপটে অহংকার করেছিল।মহান আল্লাহ তাকে তার ধন সম্পদসহ জমিতে ধ্বসিয়ে দিয়েছেন।কুরআনে সূরা ক্বসাসের ৭৯-৮১ নং আয়াতে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন।

পৃথিবীতে টাকার বলে যারা অহংকার করে তাদের শিক্ষার জন্য ক্বারূনের কাহিনি যথেষ্ট।

হযরত দাউদ ও সুলাইমান (আ:) কেও মহান আল্লাহ অঢেল রাজত্ব ও সম্পদ দিয়েছিলেন।যা দুনিয়াতে কাউকে দেননি।তাদেরকে মহান আল্লাহ্ যত দিয়েছেন তারা তত মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছেন। তারা তত নম্র হয়েছেন।তত বেশি ইবাদত করেছেন। তত মহান আল্লাহর দরবারে নত হয়েছেন। এটাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের পরিচয়।

আমাদের সমাজে মানুষের টাকা একটু বেশি হলেই অহংকারের শেষ থাকে না। তার এই অহংকারই তাকে আবার দরিদ্র করে দেয়। মূলত যারা টাকা বেশি হলে অহংকার করে, তাদের ধনী হওয়া যোগ্য করে না। এই জন্যই তারা অহংকারের ফলে আবার ধ্বংস হয়ে যায়।

৮।গরিব গৌরবী:

আপনি একজন রিকশাচালক। দিনে তিনশ টাকা ইনকাম করেন অথচ আপনার চালচলন-হাবভাবে অতি বাড়াবাড়ির শেষ নাই।

অহংকার করা মহা পাপ।আর যেখানে আপনার চলার সামর্থ্য নেই সেখানে আপনি কিসের ভিত্তিতে অহংকার করেছেন। আপনি কেন বাজার থেকে বড় ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।অথচ আপনার সামর্থ্য নেই। আপনি কেন স্ত্রীর জন্য দামি শাড়ি কিনছেন। গরিব গৌরবী দরিদ্রতার অন্যতম কারন। পাশের বাড়ির লোকের সাথে আপনাকে পাল্লা দিতে হবে।আপনার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েকে সমাজে অবস্থান রক্ষা করতে হবে।তাই বিবেকহীনতা ও বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়ে নিজের টাকা ধ্বংস করে অবস্থান রক্ষা করছেন।মহান আল্লাহ তিন শ্রেণির ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের মাঠে কথা বলবেন না। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গরীব গৌরবী।

[রিযিক্ব-বই থেকে]

৯।শোকরহীনতা (কৃতজ্ঞতার অভাব):

আল্লাহ যে নেয়ামত দেন তার পুরোপুরি কদর না করা রিযিকের হ্রাসের কারণ। শোকর হচ্ছে রিযিক বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান মাধ্যম। যখন শোকরহীনতা বৃদ্ধি পায়, তখন আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত সংকুচিত হয় এবং রিযিকের প্রকৃত প্রবাহ কমে যায়। শোকর রিযিককে ধরে রাখে।আর এর অভাব রিযিককে ক্ষয় করে।

১০।আল্লাহর উপর ভরসার অভাব (তাওয়াক্কুল না থাকা):

তাওয়াক্কুল অর্থ আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরতা। যখন মানুষ নিজ শক্তি, কৌশল বা চিন্তাকেই একমাত্র ভরসা মনে করে এবং আল্লাহর উপর নির্ভরতা হারায়।তখন রিযিক সংকুচিত হয়।কারণ আল্লাহই রিযিকদাতা, এবং তাঁর উপর নির্ভরতা রিযিকের পথ খুলে দেয়। তাওয়াক্কুলের অভাব রিযিকের বরকত কমিয়ে দেয়।

১১।দান-সদকা বন্ধ রাখা:

সদকা হলো রিযিক বৃদ্ধি ও পরিশুদ্ধির শক্তিশালী মাধ্যম। এটি মানুষের নফসকে বিশুদ্ধ করে এবং আল্লাহর রহমত আকর্ষণ করে। যখন কেউ দান-সদকা থেকে নিজেকে বিরত রাখে, তখন তার রিযিক সংকুচিত হয় এবং বরকত নেমে আসে না। কৃপণতা হৃদয়কে সংকুচিত করে এবং রিযিকের প্রবাহও সংকুচিত হয়ে যায়।

১২।আলস্য, গাফিলতি ও পরিশ্রমের অভাব:

আল্লাহ কুরআনে স্পষ্টভাবে বলেছে,মানুষ যা অর্জন করে তা তার প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করে। পরিশ্রমের অভাব, দায়িত্বহীনতা এবং সময় নষ্ট করা রিযিকের হ্রাসের কারণ। চেষ্টা-পরিশ্রমের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ রিযিকের দরজা খোলেন না। অধ্যবসায় ও পরিশ্রমই রিযিক বৃদ্ধির স্থায়ী পথ।

১৩।আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা:

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা রিযিক বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম। সম্পর্ক ছিন্ন করা আল্লাহর অসন্তোষ ডেকে আনে এবং রিযিক সংকুচিত হয়। কারণ পরিবার ও আত্মীয়তার বন্ধন

রিজিকের বরকতের সাথে গভীরভাবে জড়িত। সম্পর্ক ভাঙলে বরকত হ্রাস পায়, এবং রিযিকের প্রবাহ কমে যায়।

১৪।হারাম কাজে সম্পদ ব্যয় করা:

সম্পদ যদি এমন স্থানে ব্যয় হয় যা আল্লাহর নিকট অপ্রীতিকর।তবে সেই সম্পদে বরকত থাকে না। হারাম কাজ, গুনাহর পরিবেশ বা নিষিদ্ধ কাজে অর্থ ব্যয় করলে রিযিক আধ্যাত্মিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ হারাম ব্যয় আল্লাহর সন্তুষ্টির বিপরীত, যা সম্পদকে অশান্ত ও অকার্যকর করে তোলে।

১৫।যাকাত না দেয়া:

যাকাত হচ্ছে ফরজ বিধান।যাকাত ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে একটি।এটি একজন মুসলমানের ধন, সম্পদ ও আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ (২.৫%) দরিদ্র ও নীচুদের জন্য দেওয়া বাধ্যতামূলক।যাকাত না দেওয়া পাপ এবং গাফিলতির বিষয় হিসেবে গণ্য।এবং এটি আল্লাহর নাফরমানি যার ফলে আল্লাহ তার ধন-সম্পদ হ্রাস বা ধসিয়ে দেন।যেমন হয়েছিল কারূনের ক্ষেত্রে তার অহংকার ও যাকাত না দেয়ার কারণে।যাকাত দিলে মূলত সম্পদ কমে না বরং বাড়ে।

১৬।মিথ্যা বলা:

আমরা অনেক সময় ভাবি—“এতটুকু করলে কী-ই বা হবে?”

একটা ছোট্ট মিথ্যা কথা বলে ফেলি, হালকা চোখের দৃষ্টি অন্যদিকে চলে গেল, ১৫ সেকেন্ডের একটা হারাম রিল ভিডিওতে আর এমন কি আছে?

ছোট ছোট গুনাহগুলোকে পাত্তা না দিলে, একসময় এই ছোটগুলোই আমাদের অন্তরকে কালো করে ফেলে।
তওবার স্পৃহা কমে যায়, ইবাদতে তৃপ্তি হারিয়ে যায়, এবং ধীরে ধীরে দ্বীন দুর্বল হয়ে পড়ে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুনাহগুলো সব সময় পাহাড় হয়ে যায় এবং সেই পাহাড়ের নিচে ধসে যেতে থাকে আমাদের ঈমানের রূহানিয়াত ও আল্লাহ্ থেকে আসা রিযিকে বরকত হ্রাস পায়।

রিযিকে বরকত

রিযিকে বরকত মূলত আল্লাহ্ যেই রিযিক দান করেন, তা শুধু পরিমাণে নয় বরং মান, স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতায়ও বৃদ্ধি পেয়ে যায়,**এটাই বরকত।**
রিযিকে বরকত হলে জীবনে সকল জিনিসের পরিমাণ, গুণমান ও প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।তা কম হলেও দীর্ঘমেয়াদে চলতে থাকে, অপচয় হয় না এবং শান্তি ও সাফল্য দেয়।কম রিযিক হলেও অভাব বা দুশ্চিন্তা কম থাকে।কাজ ও অর্জনে স্থায়িত্ব আসে।রিযিকের স্বাভাবিক বৃদ্ধি না হলেও মান ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়।
যেসকল কাজ করলে রিযিকে বরকত আসে—

১. তাকওয়া (আল্লাহভীতি)

তাকওয়া হলো আল্লাহর প্রতি ভয়, সচেতনতা ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে জীবন পরিচালনা করা। তাকওয়ার ফলে ব্যক্তি পাপ থেকে দূরে থাকে এবং নৈতিকতা বজায় রাখে। আল্লাহভীতি সম্পন্ন ব্যক্তি সৎ পথে চলার কারণে আল্লাহ তাঁর জন্য রিযিকের বিশেষ দরজা উন্মুক্ত করেন এবং জীবন-সংগ্রামে সহজতা প্রদান করেন। তাকওয়া শুধু আধ্যাত্মিকতা নয়; এটি ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পেশাগত জীবনে প্রভাব ফেলে এবং রিযিককে স্থিতিশীল করে তোলে।

২।ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)

ইস্তিগফার হলো নিজের ভুল, অপরাধ, অবহেলা ও পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। নিয়মিত ইস্তিগফার মনকে পবিত্র করে, মানসিক চাপ কমায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ায়। যখন বান্দা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তখন আল্লাহ তার জীবনে সংকীর্ণতা দূর করেন এবং রিযিকে প্রশান্তি ও সমৃদ্ধি দান করেন।

৩। সাদকা/দান

সাদকা শুধু অর্থ প্রদান নয়—জ্ঞান, সময়, সহানুভূতি, সাহায্য—সবই সাদকার অন্তর্ভুক্ত। দান ব্যক্তি-মানস ও সমাজে ইতিবাচক তরঙ্গ সৃষ্টি করে। দানের ফলস্বরূপ আল্লাহ্ রিযিকের ঘাটতি পূরণ করেন, অজানা বিপদ দূর করেন এবং বরকত বৃদ্ধি করেন। এটি মানুষের হৃদয়কে উদার করে এবং সমাজে বিশ্বাস ও সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি করে।

৪। আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা

আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি ও রক্ষা করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদেশ। আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ, খোঁজখবর নেওয়া, সহযোগিতা করা এবং সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে শক্তিশালী বন্ধন সৃষ্টি হয়। এটি শুধু মানসিক শান্তি নয়, বরং রিযিকের প্রসারেও ভূমিকা রাখে। পারিবারিক সৌহার্দ্য বরকতের অন্যতম উৎস।

৫।হালাল উপার্জন

হালাল পথে উপার্জন করা রিযিক বৃদ্ধির মূল ভিত্তি। হারাম উপার্জন ব্যক্তিকে মানসিকভাবে অস্থির করে তোলে, পরিবারে অশান্তি আনে এবং বরকত নষ্ট করে। বিপরীতে হালাল উপার্জন আশীর্বাদযুক্ত, শান্তিপূর্ণ এবং দীর্ঘমেয়াদে ফলপ্রসূ। সততা, পরিশ্রম, ন্যায়পরায়ণতা ও আন্তরিকতা উপার্জনকে বরকতময় করে তোলার মূল উপাদান।

৬।সালাত প্রতিষ্ঠা

সালাত ব্যক্তিকে শৃঙ্খলাপূর্ণ, সচেতন ও নৈতিক করে তোলে। নিয়মিত নামাজ মানুষের সময় ব্যবস্থাপনা উন্নত করে এবং মনোসংযোগ বাড়ায়। এই আধ্যাত্মিক সংযোগ ব্যক্তি ও সমাজে শান্তি নিয়ে আসে।ফলে রিযিকের পথও উন্মুক্ত হয়।

৭। সকালবেলায় কাজ শুরু করা

সকালের সময় প্রকৃতিগতভাবে শান্ত, স্বচ্ছ এবং উৎপাদনশীল।নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর কথায় উল্লেখ আছে যে দিনের প্রথম অংশে বরকত রয়েছে। সকালে কাজ শুরু করলে মন সতেজ থাকে, ভুল কম হয় এবং কাজের মান বৃদ্ধি পায়। এর ফলে রিযিকও স্থিতিশীল ও অধিক ফলপ্রসূ হয়।

৮। পিতা-মাতার দু'আ লাভ করা

পিতা-মাতার সন্তুষ্টি ও দু'আ জীবনে অপরিসীম শক্তি ও বরকত এনে দেয়। তাদের আন্তরিক দোয়া সন্তানের রিযিক, স্বাস্থ্য, কাজ ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রতিকূল অবস্থায়ও পিতা-মাতার দু'আ অনেক সময় অদেখা সুযোগ তৈরি করে।

৯। আমানতদারী (বিশ্বাসযোগ্যতা)

আমানতদার ব্যক্তি সমাজে ও কর্মক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করে। তার ওপর মানুষের আস্থা বাড়ে, যা ব্যবসা-বাণিজ্য ও দায়িত্বে উন্নতির পথ খুলে দেয়। আমানতদারী কর্মক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ও রিযিকে বরকত আনে।

১০। সত্যবাদিতা

সত্যবাদিতা মানুষের চরিত্রকে শক্তিশালী করে এবং সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করে। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির সাথে লেনদেন করতে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, ফলে উপার্জনের পথ আরও সুদৃঢ় হয়। মিথ্যাচার বরকত নষ্ট করে, অথচ সত্যবাদিতা রিযিকের ভিত্তিকে মজবুত করে।

১১। দু'আ

দু'আ বান্দার অন্তরকে আল্লাহর দিকে উন্মুক্ত করে। দু'আ রিযিক, শান্তি ও সফলতার অন্যতম মাধ্যম। দু'আর মাধ্যমে বান্দা অদৃশ্যভাবে আল্লাহর সাহায্য লাভ করে, যা রিযিক বৃদ্ধির একটি বাস্তবিক কারণ।

১২।শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা)।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানে—যা কিছু আছে তা সম্মানের সাথে গ্রহণ করা, অভিযোগ থেকে দূরে থাকা এবং আল্লাহর নিয়ামত চিনে নেয়া। কৃতজ্ঞতা হৃদয়কে প্রসারিত করে এবং নতুন অনুগ্রহ লাভের দরজা খুলে দেয়।

১৩। তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর ভরসা)

তাওয়াক্কুল হলো প্রচেষ্টা করা, তারপর ফলাফল আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেওয়া। তাওয়াক্কুল উদ্বেগ কমায়, কাজের প্রতি মনোযোগ বাড়ায় এবং আল্লাহর অদৃশ্য সাহায্যের দরজা খোলে। এর ফলে রিযিক সহজে লাভ হয় এবং বরকত বৃদ্ধি পায়।

১৪। হারাম থেকে বিরত থাকা

হারাম উপার্জন সাময়িক লাভ দিলেও বরকত নষ্ট করে। হারাম রিজিক মানুষকে অস্থিরতা, অসুখী জীবন, পারিবারিক বিবাদ ও ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দেয়। হালালের প্রতি দৃঢ়ভাবে অনুগত থাকা রিযিকের নিরাপত্তা ও প্রসারের অন্যতম রহস্য।

১৫। সন্তানের ভালো লালন-পালন

সৎ, নৈতিক, ঈমানদার সন্তান পরিবারে শান্তি ও বরকতের উৎস। এমন সন্তান ভবিষ্যতে পরিবারের রিযিকে সহায়ক হয় এবং সমাজেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

১৬। অতিথি আপ্যায়ন

অতিথি আপ্যায়ন উদারতা, সহানুভূতি ও মানবিকতার বহিঃপ্রকাশ। এটি ঘর থেকে কৃপণতা দূর করে এবং রিযিকে বরকতময় করে। অতিথি ঘরে প্রবেশ করলে রহমত প্রবেশ করে— এমন ধারণা ইসলামী শিক্ষায় পাওয়া যায়।

১৭। ঘরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

পরিচ্ছন্ন ঘর মানসিক শান্তি, স্বাস্থ্য এবং সুসংগঠিত জীবনযাপনের সহায়ক। পরিচ্ছন্নতার ফলে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমে, মন পরিষ্কার থাকে এবং অদৃশ্য বরকত আসে।

১৮। বিবাহ ও নেক পারিবারিক জীবন

বিবাহ স্থিতিশীলতা, দায়িত্ববোধ এবং সহযোগিতা এনে দেয়। নেক পরিবার লক্ষ্য, কাজ এবং উপার্জনের প্রতি ইতিবাচকতা তৈরি করে। ফলে রিযিক সহজ, স্থায়ী ও ফলপ্রসূ হয়।

১৯। ঝগড়াবিবাদ থেকে দূরে থাকা

ঝগড়া-বিবাদ মন ও পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি করে। শান্তিপূর্ণ মন বরকতের জন্য প্রয়োজনীয়। বিবাদ থেকে দূরে থাকলে রিযিকের পথে বাঁধা কমে।

২০।যাকাত প্রদান

যাকাতের অর্থ হলো **"পরিশুদ্ধতা" বা "শুদ্ধ হওয়া।"**
যাকাত দিতে সম্পদ পরিশুদ্ধ হয়, দাতার নফস অহংকার ও লোভ থেকে মুক্ত হয়।সমাজে সম্পদ সুষমভাবে বণ্টিত হয়।
যাকাত শুধু আর্থিক দান নয়; এটি একাধারে ইবাদত, সামাজিক দায়িত্ব, নৈতিক শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যম।

২১। দরূদ পাঠ

দরূদ পাঠে আল্লাহর রহমত নেমে আসে। রহমত বরকতের মূল ভিত্তি। ফলে জীবনে প্রশান্তি, সাফল্য ও রিযিকের নতুন পথ উন্মুক্ত হয়।

দরূদ: اَللَّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ)

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রহমত ও শান্তি দান করুন।

যখন আপনি সারাক্ষণ দরুদ শরীফ পড়তে থাকেন, তখন আপনার মন, চিন্তা, এমনকি আত্মাটাও প্রিয় নবী ﷺ এর অনুপ্রেরণাতে ভরে যায়। আপনি অজান্তেই তাঁর জীবন, তাঁর ধৈর্য, তাঁর বুদ্ধিমত্তা, তাঁর সম্মান নিয়ে ভাবতে থাকেন। ধীরে ধীরে তাঁর প্রতিটি গুণ যেন আপনাকেও নিজের জীবনে সেরকম হতে অনুপ্রাণিত করে, তাগাদা দেয় ভালো মানুষ হতে, শান্ত হতে, রহমত প্রাপ্ত একজন মুসলিম হতে।

আর জানেন কি? আপনি যখন প্রিয় নবী ﷺ এর ওপর সালাম পাঠান, তখন আল্লাহ নিজেই আপনার ওপর সালাম পাঠান! সুবহানাল্লাহ!

"যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠায়, আল্লাহ তাঁর ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন।"
[মুসলিম,৩৮৪]

চলুন, এই ভালোবাসার ধারাটা না থামাই —কারণ প্রিয় রসূল ﷺ কে মনে রাখার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারি।

তাই,
দুরুদ কে সঙ্গী বানাই। ইং শা আল্লাহ্।

২২।গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা:

শুধু ইবাদত নয়, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাটাই আসল তাকওয়া।

অনেক সময় আমরা মনে করি বেশি ইবাদতই জান্নাতের নিশ্চয়তা।কিন্তু ইসলাম আমাদের শেখায়, ইবাদতের সাথে গুনাহ থেকে বিরত থাকা, অন্যথায় সেই ইবাদত ফলপ্রসূ হয় না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۝

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখে তাদেরকেও ভালোবাসেন।”

[সূরা আল-বাকারা,২:২২২]

এথেকে বুঝতে পারছি, শুধু ইবাদত নয়,
গুনাহ থেকে ফিরে আসা (তাওবা) এবং নিজেকে পবিত্র রাখা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাকো; আর যা আদেশ করেছি, তা যতটুকু পারো পালন করো।"

[বুখারী ৭২৮৮, মুসলিম ১৩৩৭]

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়,

গুনাহ থেকে বিরত থাকা ইবাদতের চেয়ে অগ্রগণ্য।

আরেকটি হাদীসে এসেছে,
"সত্যিকার মুমিন সেই, যার হাত ও জবান থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে।"
[সহীহ বুখারী ১০]

অর্থাৎ, শুধু নামাজ, রোজা নয় অন্যের প্রতি ক্ষতি না করা, গীবত-পরনিন্দা থেকে বাঁচা, অন্যায় থেকে দূরে থাকা এসবও জান্নাতের পথ।

ইবাদত আপনাকে জান্নাতের পথে এগিয়ে দেয়,কিন্তু গুনাহ সেই পথকে বন্ধ করে দেয়।
তাই প্রকৃত মুত্তাকি সেই ব্যক্তি, যে ইবাদতের পাশাপাশি গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকে।তাই সুন্দর এই দো'আ টি আমাদের দৈনন্দিন আমলের অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি-

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

“হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার স্মরণ, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও উত্তম ইবাদতে সাহায্য করো।”

খন্দকের যুদ্ধে খাবারের বরকত —
—এক অলৌকিক ঘটনা।

মদিনার চারদিকে শত্রুরা ঘিরে ফেলেছে। সাহাবিরা দিন-রাত খন্দক খুঁড়ছেন, ক্ষুধা–ক্লান্তি তাদের কাবু করে ফেলেছে। শীতের হাওয়া কাঁপিয়ে দিচ্ছে শরীর আর শক্তিশালী শিলাখণ্ড ভেঙে খন্দক তৈরি করা তাদের জন্য আরও কঠিন করে তুলছে। এত পরিশ্রম আর ক্ষুধার কারণে অনেক সাহাবীর পেটে কয়েক দিন কিছু যায়নি।

এই কঠিন সময়ে জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) দেখলেন,নবী মুহাম্মদ ﷺ–এর পেটে পাথর বাঁধা চরম ক্ষুধায় সে সময় সাহাবীরা পেটে পাথর বেঁধে শক্তি ধরে রাখতেন। এর দৃশ্য দেখে জাবির (রাঃ)-এর হৃদয় ভেঙে যায়। তিনি চাইলেন যা সামান্য আছে,সেটুকু দিয়েই নবী মুহাম্মদ ﷺ–কে কিছু খাওয়াতে।

জাবির (রাঃ) গোপনে বাড়িতে এলেন।

তিনি বাড়িতে এসে দেখলেন ঘরে খুবই সামান্য খাবার। শুধু এক মুঠো গমের আটা আর একটা ছোট ছাগলছানা।
তিনি স্ত্রীকে বললেন,
"তুমি দ্রুত এগুলো প্রস্তুত করো।আমি আল্লাহর রাসুল ﷺ-কে নিয়ে আসছি তিনি একা এসে সামান্য রুটির সাথে একটু মাংস খেয়ে যাবেন।"
স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন,"একাই আসবেন তো?"
জাবির বললেন,"হ্যাঁ, আমি তাই বলেই গেছি।"

এরপর নবী মুহাম্মদ ﷺ শুধু নিজে এলেন না।পুরো দল নিয়ে এলেন!
জাবির (রাঃ) ধীরে ধীরে নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে গিয়ে বললেন,
"ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার স্ত্রী অল্প খাবার প্রস্তুত করেছে। আপনি দয়া করে একা এসে খান।"
কিন্তু নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর অভ্যাস ছিল,যে নিয়ামত তিনি পেতেন, তা সবার সাথে ভাগ করে নিতে।

তিনি উচ্চস্বরে বললেন—
"হে খন্দকবাসীরা! জাবির আমাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করেছে! চলো সবাই যাই!"

জাবির (রাঃ) হতবাক! তাঁর পা যেন কাঁপছে। মনে মনে ভাবলেন,
"ইয়া আল্লাহ! এ খাবার তো একজনকেও ঠিকভাবে তৃপ্ত করতে পারবে না... এত লোকের জন্য কীভাবে?"
নবী মুহাম্মদ ﷺ জাবিরের ঘরে পৌঁছে বরকতের দু'আ করলেন।

নবী মুহাম্মদ ﷺ ঘরে এসে জাবিরের স্ত্রীকে দেখতে পেলেন। তিনি খাবারের পাত্র খুলে দেখলেন সামান্য আটা এবং রান্না করা মাংস।

নবী মুহাম্মদ ﷺ বললেন,
"কিছু স্পর্শ করো না, পাত্র ঢেকে রাখো। আমি বরকতের দোয়া করবো।"

এরপর তিনি মাংসের পাত্রে হাত রাখলেন ও রুটির আটা স্পর্শ করলেন।
ও আল্লাহর কাছে বরকতের দু'আ করলেন।
এটা ছিল এক মুহূর্ত কিন্তু আকাশ যেন পুরো ঘরের উপর রহমতের পর্দা বিছিয়ে দিল।

অলৌকিক বরকত....

অল্প খাবার অসংখ্য মানুষের জন্য যথেষ্ট হলো।

নবী মুহাম্মদ ﷺ বললেন,
“রুটি বানানো মানুষটি থামবে না। আর পাত্র চুলা থেকে নামিও না।”

এরপর সাহাবীরা দলবদ্ধভাবে ঘরে ঢুকলেন।
১০ জন....
২০ জন....
৩০ জন....
৪০ জন....
এভাবে শতাধিক সাহাবী এসে খেয়ে গেলেন।
প্রত্যেকেই পেট ভরে খেয়ে হাসিমুখে পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে গেলেন।
কিন্তু আশ্চর্য!
পাত্রের খাবার তখনো রয়ে গেল....
যেন কেউ খায়নি!

এ ছিল এক মহান মু'জিযা।নবী মুহাম্মদ ﷺ–এর দু'আ ও স্পর্শে আল্লাহ খাবারে অশেষ বরকত সৃষ্টি করেছিলেন।
সুবহানাল্লাহ্!!

[বুখারি ৪১০২,মুসলিম ২০৩৯]

হালাল, সৎ ও তাওয়াক্কুলপূর্ণ কাজই দেয় জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধিতে বরকত।আমাদের জন্য অবশ্যক হলো একথা ও কাজগুলো আমাদের ক্বলবে রাখা ও ওই অনুযায়ী সামমে অগ্রসর হওয়া।

সদাকা অনুগ্রহ নয়

ইসলামে দানের ধারণা এমন যে, **দাতা কাউকে উপকার করেন না বরং দান গ্রহণকারীই দাতার উপকার করেন**। কারণ যে ব্যক্তি দান গ্রহণ করে, সে দাতাকে **আখিরাতের সওয়াব অর্জনের** দ্বার খুলে দেয়।সদাকা কাউকে ছোট করা, দয়া দেখানো বা অনুগ্রহ হিসেবে দেওয়া নয়; বরং এটি আল্লাহর জন্য করা একটি **ইবাদত।**
রাসূল ﷺ বলেছেন,
'সদাকা দরিদ্রের হাতে পৌঁছানোর আগেই আল্লাহর হাতে পৌঁছে যায়।'

অর্থাৎ,দানের সওয়াব আসলে আল্লাহর কাছেই পৌঁছে।

অন্যদিকে, দানকারীর জন্য **সদাকা পাপ মোচন, রিযিক বৃদ্ধি এবং বিপদ থেকে রক্ষা** পাওয়ার মাধ্যম। তাই দাতা নয়, দানগ্রহীতাই দাতাকে প্রকৃতভাবে সাহায্য করেন। এজন্য ইসলাম দান দিয়ে বড়াই করা, অনুগ্রহ দেখানো বা কাউকে হেয় করা কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। কোরআনে বলা হয়েছে—“দান করে অনুগ্রহ দেখিও না, কষ্ট দিয়ো না।”

আল্লাহ যাকে চান ধনী করে পাঠান আর যাকে চান গরীব করে পাঠান।সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছা।যে ধনী তার মনে রাখতে হবে আমাকেও আল্লাহ ইচ্ছে করলে ফকির বানাতে পারতেন।তখন আমি আমার ভাইয়ের মুখাপেক্ষী হতাম এখন যেমন সে আমার মুখাপেক্ষী।
সুতরাং আমি ফকির হলে আমার সঙ্গে তার যে আচরণ আমি কামনা করতাম,আমারও এখন তার সঙ্গে সেই আচরণ করতে হবে।

মনে রাখতে হবে আমি যা তাকে দিচ্ছি, তার রিযিকই দিচ্ছি, আমার অনুগ্রহ নয়। আমি তো একজন **প্রতিনিধি।** যাকে টাকা পৌঁছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সে যেমন এই টাকা প্রদানকে তার অনুগ্রহ মনে করে না,আমার তা মনে করার সুযোগ নেই।
সুতরাং যে ব্যাক্তি কাউকে দান করবে, সে তার রিযিকই তার হাতে পৌঁছে দিচ্ছে। তবে তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ অর্পণ করেছেন, তাকে কিছু নেক উপার্জনের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।
মনে রাখতে হবে, সম্পদ আমার গোলাম ; আমি সম্পদের গোলাম নই। সুতরাং আমি যেন সম্পদের গোলাম না হই।কারণ সম্পদের গোলামের ধ্বংস অনিবার্য।
তোমার সম্পদ কোথায়?! তোমার সম্পদ তো যা তুমি ভক্ষণ করে শেষ করেছ! যা পরিধান করে পুরাতন করেছো! কিংবা যা দান করে আখেরাতে জমা করেছ।

সদাকার আসল মর্যাদা হলো,এটি কারও ওপর উপকার নয়, বরং আল্লাহর পথে নিজের জন্য আমল সংগ্রহ করা। যে দেয় সে নিজেকেই নিজের জন্য দেয় পরকালে উত্তম ফলাফল লাভের উদ্দেশ্যে।

একজন গোপনে দানকারীর সদাকা আল্লাহর কাছে পৌঁছে এবং আল্লাহ তা তাঁর জন্য দশগুণ বা অসংখ্য গুণ করে দেন।যদি কেউ অন্যকে ছোট বা নিচু দেখানোর জন্য দান করে, তবে সেই দান থেকে দাতা কোনো বরকত পায় না।
সদাকা কোনো ব্যক্তিগত গর্ব, ক্ষমতা প্রদর্শন বা অন্যকে দেখানোর জন্য দেওয়া নয়। বরং এটি **আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের** একটি মাধ্যম। আমরা যে কোনো দান করি, সেটা আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য করি, অন্যের উপর "আমি দিচ্ছি" এমন অহংকার দেখানোর জন্য নয়।বরং এটি আল্লাহর পথে করা ইবাদত, যা দাতাকে বরকতময় করে এবং সমাজে ন্যায় ও সহানুভূতির বন্ধন তৈরি করে।

সদাকা কোনো ব্যক্তিগত অনুগ্রহ বা অহংকারের প্রকাশ নয়।এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একটি **ইবাদত।** দানকারীর উদ্দেশ্য যদি শুধুমাত্র দরিদ্রকে প্রভাবিত করা বা সমাজে নিজের স্থান দৃঢ় করা হয়, তবে সে সদাকার প্রকৃত বরকত পায় না।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সদাকা হলো একান্তই আত্মশুদ্ধি, নৈতিক উন্নতি এবং দরিদ্রের উপকারের মাধ্যম। গোপনে বা খোলামেলাভাবে সৎ উদ্দেশ্যে দেওয়া সদাকা আল্লাহর কাছে পৌঁছায় এবং দাতার জন্য দুনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের বরকতও নিশ্চিত করে। তাই সদাকার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত আল্লাহর ইচ্ছা অনুসরণ, যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কেই নৈতিক, আত্মিক এবং সামাজিকভাবে সমৃদ্ধ করে।

জ্ঞানার্জন রিযিকেরই একটি রূপ

আল্লাহ মানুষকে শুধুমাত্র অর্থ বা খাবারের জন্যই সৃষ্টি করেননি। মানুষের জীবনে উন্নতি, বুদ্ধিমত্তা, সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগও প্রয়োজন। জ্ঞান মানুষকে এসব ক্ষমতা দেয় এবং জীবন পরিচালনার জন্য অপরিহার্য। তাই আল্লাহ জ্ঞানকেও রিযিকের অংশ হিসেবে দিয়েছেন।কারণ এটি মানুষের জীবনে সঠিক পথে চলার, সফলতা পাওয়ার এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয়।

জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে বহু সহীহ হাদিস আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুপরিচিত কয়েকটি নিচে দেয়া হলো—

১. জ্ঞান অর্জন ফরজ

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।"

[ইবনে মাজাহ ২২৪]

২. জ্ঞান অনুসন্ধান এক প্রকার ইবাদত

রাসুল ﷺ বলেছেন:

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"

[মুসলিম ২৬৯৯]

৩. জ্ঞানী ব্যক্তি আলোকবর্তিকা

নবী ﷺ বলেন:

"আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব আবেদ (শুধু ইবাদতকারী)-এর ওপর এমন, যেমন আমার শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদের সবচেয়ে নিম্ন ব্যক্তির ওপর।"

[তিরমিজি,২৬৮৫]

৪. মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ, যে শিখে এবং অন্যকে শেখায়।"

[সুনানে দারেমী৩৮০]

৫. জ্ঞান রেখে দিলে সওয়াব চলতে থাকে

রাসুল ﷺ বলেছেন:

“মানুষ মারা গেলে তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি ছাড়া— সদকা জারিয়া, উপকারী জ্ঞান, এবং সৎ সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।”

[মুসলিম ১৬৩১]

হজরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি জীবনের শুরুতে জ্ঞান না থাকায় অনেক সীমাবদ্ধতা অনুভব করতেন। কিন্তু তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য পরিশ্রম করলেন,মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন এবং শৃঙ্খলা ও ন্যায়ের শিক্ষাগুলি শিখলেন। এই জ্ঞানই পরে তাকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা দিল এবং আল্লাহ তার রিযিক বাড়ালেন।তিনি শুধু অর্থ বা ক্ষমতাই পেলেন না বরং সম্মান, মানুষকে সেবা করার সুযোগ এবং ইসলামের সঠিক পথে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগও পেলেন।

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য জ্ঞান অর্জন করে, আল্লাহ তার রিযিককে বৃদ্ধি করেন।”

আরেকটি উদাহরণ হলেন নবী মুহাম্মদ ﷺ নিজেই। তিঁনি ছোটবেলা থেকেই জ্ঞান অর্জনের দিকে মনোযোগী ছিলেন।সেই জ্ঞানই তাঁর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক ও ক্ষমতা হিসেবে কাজ করেছিল।যার মাধ্যমে তিনি মানুষকে শিক্ষা দিতেন।দুনিয়ায় শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ইসলামের উদ্দেশ্য সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আমাদের অনেকেরই ধারণা বয়স বেড়ে গেলে জ্ঞান অর্জন আর করা যায় না।এই ধারণা আসলে ভুল।আমাদের (আইওএম) ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা-তেই আমাদের ব্যাচে এমন অনেক বোন আছেন যাদের বয়স ৪৫+বছর।শুধু আমাদের ব্যাচ না সকল ব্যাচেই এমন কয়েকজন পাওয়া যায়।এমনি যেখানে বয়সে কম অনেক বোনই ঝরে পড়েছেন আগের সেমিস্টারগুলোতেই,সেখানে ৪৫+ বয়সের বোনেরা সম্পূর্ণ কোর্স-ই শেষ করতে পারছেন সফলভাবেই।মা শা আল্লাহ্! লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।

আর,

বিশেষ করে কুরআন হিফযের ক্ষেত্রে আমরা মনে করি,বয়স বাড়ে যাওয়া মানে হিফয করা আর সম্ভবই না।এটাও একেবারে ভুল।

আমাদের ব্যাচের এক হাফিযা বোনের থেকে শুনা–উনি বলেছিলেন,একবার উনি ইংল্যান্ডে একটা কুরআন ক্যাম্পেইনে যান।যেখানে এক বড় বোনের সাথে পরিচয় হয় যিনি ৫২+ বছর বয়সে হিফয করেন।সুবহানাল্লাহ!

এমন আরো অনেকেই আছেন যাদের নাতি-নাতনি আছে,অনেকেই বাচ্চা নিয়ে হিফয করছেন।

উনাদের কথা ভাবলে আসলে আবাক না হয়ে পারা যায় না।
দেখা যায়,বয়সে কম অনেকই পেরে উঠতে পারছে না।কিন্তু উনারা ঠিকই এই বয়সে গিয়েও সফলভাবে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন।উনাদের ইলম ও আমলে বারাকাহ্ দিতেন সাথে আমাদেরও।আমীন ইয়া রব্বী।

এটা আসলে মহান আল্লাহ তাআ'লার হিকমাহ্।তিনি যাকে ইচ্ছা দেন আর যার থেকে ইচ্ছা নিয়ে নেন বা দেন না।যা বুঝার ক্ষমতা আমাদের নেই।
আল্লাহ্ তাআ'লা আমাদের রিযিকে উপকারী জ্ঞান দান করতেন।এবং ওই অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিতেন।আমীন।

মুমিন কখনো হতাশ হয় না

মুসলিম রিজিকের বিষয়ে কখনো হতাশ হয় না।
কারণ সে জানে **রিজিক আল্লাহর জিম্মায়।** যত কষ্ট, দেরি বা অনিশ্চয়তাই আসুক না কেন একজন মুমিন বিশ্বাস করে যে,তার জন্য নির্ধারিত রিজিক তাকে কখনো এড়িয়ে যাবে না। সে পরিশ্রম করে হালাল উপায়ে চেষ্টা করে আর ফলাফল আল্লাহর হাতে সমর্পণ করে। তাই উদ্বেগ থাকতে পারে কিন্তু মনে হতাশা নয়।কারণ আল্লাহ বলেছেন,

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ

"যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট।"

[সূরা ত্বলাক্ব,৬৫:০৩]

এই বাণীর ওপর ঈমানই তাকে শক্তি দেয়, ধৈর্য্য দেয়, এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী রাখে।

রিযিককে মুসলিম শুধুমাত্র টাকা-পয়সা বোঝে না।বরং জীবনের সব প্রয়োজন যেমন; খাবার,পোশাক,সম্মান,সুযোগ,ভালো সম্পর্ক,সুস্থতা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া রিযিক হিসেবে দেখে। তাই একজন সত্যিকারের মুমিন রিযিক নিয়ে দুশ্চিন্তা করলেও হতোদ্যম হয় না।কারণ সে জানে,আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন তাই তাকে রিযিক দেবেনই।

একজন মুমিন বিশ্বাস করে যে আল্লাহ্ প্রতিটি প্রাণীর রিযিক লিখে রেখেছেন তার জন্মের আগেই। যে রিযিক তার ভাগ্যে আছে তা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না।আর যা নেই,তা কোনো জোরজবরদস্তি বা দুনিয়ার শক্তি দিয়েও পাওয়া যায় না। এই বিশ্বাস তার হৃদয়ে এক ধরনের স্থিরতা তৈরি করে।
মানুষের কাছে হীন হওয়া, হারাম পথে যাওয়া, অথবা আত্মসম্মান বিসর্জন দেওয়ার প্রয়োজন থাকে না।কারণ রিযিক মানুষের হাতে নয়, আল্লাহর হাতে।

হতাশ না হওয়ার মানে এই নয় যে মুসলিম বসে থাকে। বরং ইসলাম পরিশ্রমকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করেছে।
মুসলিম চেষ্টা করে, পথে নামে, নতুন সুযোগ খোঁজে।কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরে আবার ব্যর্থ হলে নতুনভাবে শুরু করে। কিন্তু তার ভরসা কোনো চাকরিতে বা কোনো মানুষের উপর নয়।তার ভরসা আল্লাহর উপর।মুমিন জানে চেষ্টা তার আর ফল দিবেন আল্লাহ্।

আরো একটি ব্যাপার হলো,মুমিন বোঝে যে রিযিক কখনো শুধু টাকা হিসেবে আসে না।কখনো স্বাস্থ্য, কখনো সন্তানের মঙ্গল, কখনো শান্তি, কখনো নিরাপত্তা...এগুলোও রিযিক। তাই এক দিক থেকে কম মনে হলেও অন্য দিক থেকে আল্লাহ অনেক বেশি দিয়ে রাখেন।
সেই প্রজ্ঞা তার হৃদয়কে কৃতজ্ঞ রাখে এবং হতাশা থেকে রক্ষা করে।
এমনকি যখন রিযিক বিলম্বিত হয়, যখন কষ্ট বাড়ে, যখন পথ বন্ধ লাগে।তখনও একজন মুসলিম বিশ্বাস করে,আল্লাহর পরিকল্পনা অবশ্যই উত্তম।
কারন আল্লাহ তাআ'লা-ই বলেছেন,

وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۝

"আর আল্লাহই সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী।"

[সূরা আল-ইমরান,০৩:৫৪]

হয়তো তিনি পরীক্ষা নিচ্ছেন বা হয়তো তাকে আরো উচ্চ স্থানে পৌঁছে দিতে চাচ্ছেন কিংবা তাকে কোনো বিপদ থেকে বাঁচাচ্ছেন।

এই কারণেই একজন প্রকৃত মুসলিম রিযিকের ব্যাপারে কখনো হতাশ হয় না। তার জীবনে অস্থিরতা থাকতে পারে, কষ্ট থাকতে পারে, দুশ্চিন্তা থাকতে পারে—কিন্তু হতাশা নয়। কারণ তার হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি রয়েছে অঘাত ভরসা বা তাওয়াক্কুল।

মুমিন কখনোই নিরাশও হবে না,হতাশও হবে না এবং কখনো আত্মহত্যাও করবে না।কারন সে জানে রাস্তা যতই ঘিরে ধরুক আসমানের রাস্তা কখনো বন্ধ হবে না।সব দরজা বন্ধ হয়ে গেলেও মহান রবের রহমতের দরজা কখনো বন্ধ হবে না বান্দার জন্য সর্বদা খোলা থাকবে।তাই যখনই রিযিকের দরজা সংকীর্ণ হয়ে যায় তখনই রবের দরবারে দু'হাত তুলে ইস্তিগফারের সাথে বারাকাহ্ চেয়ে নেয়া।

দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষেরা

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্নিত তিনি বলেন, 'আমি ৭০ জন আহলে সুফফাকে এই অবস্থায় দেখেছি, তাদের কারো কাছে গা ঢাকায় জন্য চাদর ছিলো না,কারো কাছে লুঙ্গি ছিলো,কারো কাছে চাদর (এক সঙ্গে দুটি বস্ত্র কারো কাছে ছিলো না) তারা তা গর্দানে বেঁধে নিতেন। অতঃপর সেই বস্ত্র কারো পায়ের অর্ধগোছা পর্যন্ত হতো এবং কারো পাশের গিরা পর্যন্ত। সুতরাং,তারা তা হাত দিয়ে জমা করে ধরে রাখতেন, যেন লজ্জাস্থান দেখা না যায়।'

[বুখারি ৪৪২]

আয়শা (রা:) থেকে বর্নিত তিনি বলেন, 'মুহাম্মদ ﷺ পরিবার কোনো সময় পরপর দুইদিন পরিতৃপ্তির সাথে যবের রুটি খেতে পান নি,এমনকি এভাবে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।'

[ইবনু মাজাহ ৩৩৪৬]

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'একদা আল্লাহ রাসুল ﷺ রাড়ি থেকে বের হলেন,রাস্তায় তাঁর সাথে আবুবকর ও ওমর (রা) সাক্ষাৎ হলো। আল্লাহ রাসুল ﷺ তাদের জিজ্ঞেস করলেন,"কিসে তোমাদেরকে বাড়ি থেকে বের করলো?" তারা জবাবে বললেন,"ক্ষুধার তাড়না, হে আল্লাহ রাসুলﷺ।"

জবাবে আল্লাহ রাসুল ﷺ বললেন,"ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। তোমাদেরকে যে ক্ষুধার তাড়না ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এসেছে,আমাকেও সেই ক্ষুধা ঘর থেকে বের করেছো।"

তারা আল্লাহ রাসুলের ﷺ সাথে চলতে শুরু করলেন এবং একজন আনসারি সাহাবী বাড়িতে আসলেন।সাহাবীর বাড়িতে সাহাবী ছিলেন না।বাড়ির মহিলা তাদেরকে স্বাগত জানালেন।

আল্লাহ রাসুল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "বাড়িওয়ালা কোথায়? "

মহিলা বললেন,আমাদের জন্য পানি আনতে গেছেন।ইতোমধ্যেই আনসারী সাহাবী চলে আসলেন। তিনি রাসুল ﷺ ও তাঁর সাহাবীকে দেখে বলেন, "আলহামদুলিল্লাহ! আজ আমার বাড়ির মেহমানদের চেয়ে সম্মানিত মেহমান কারও নাই।"

তারপর তিনি বের হয়ে গেলেন এবং খেজুরের একটা ছড়া নিয়ে আসলেন তাতে পাকা কাঁচা সব রকমের খেজুর ছিলো।তিনি তাদেরকে বললেন,আপনারা খান! এই বলে ছুরি হাতে নিলেন।

আল্লাহর রাসুল ﷺ বললেন,"দুধ দানকারী ছাগল জবাই করো না"।

অতঃপর সাহাবি একটি ছাগল জবাই করলেন।আল্লাহ রাসুল ﷺ আবুবকর ও ওমর (রা) সেই গোশত থেকে খেলেন।তারপর যখন পরিতৃপ্ত হয়ে গেলেন।তখন আল্লাহর রাসুল ﷺ তার দুই সাহাবীদের লক্ষ করে বললেন, "নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন এই নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।তোমরা ঘর থেকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয়েছিলে,এখন আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করে বাড়ি ফিরছো"।

[মুসলিম ৫৪৩৪]

দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন তাঁরা।তাঁরা চাইলেই আল্লাহ্ তাঁদেরকে অঢেল সম্পদ দিয়ে ভরিয়ে দিতেন।অথচ তাঁরা পরকালকে ভিত্তি করে তাঁদের জীবন পরিচালিত করেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

হতভাগা তো আমরা......।আমাদের কাছে বস্তুই সবকিছু। ধন-দৌলত, জমি-জায়গাই সবকিছু।আমাদের ভাবখানা এমন যেন,জান্নাত তো আমাদের নানা বাড়ি।

সত্যি বলতে কি...আল্লাহর নিকট যেমন দুনিয়ার বিন্দুমাত্র মূল্য নেই,তেমনি তাঁর প্রকৃত বান্দাদের নিকটও দুনিয়ার বিন্দুমাত্র মূল্য নেই। তাঁদের জীবনে স্বপ্ন ও আশা কোন সময় দুনিয়া ভিত্তিক গড়ে উঠেনি। তাঁদের লক্ষ সবসময় ছিল পরকাল।

রিযিকে সংকীর্ণতা দূর করার কুরআনী নুসখা

রিযিকের সংকীর্ণতা দূর করার জন্য প্রথমে **আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা ও তাকওয়া রাখা** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কুরআনে বর্নিত সূরাগুলোর অনেক ফজিলত রয়েছে রিযিকে সংকীর্ণতা দূর করার। শুধু সংকীর্ণতা নয় কুরআন তিলাওয়াতের ফলে একদিকে যেমন ঘরে বরকত আসে তেমনি নেকির পাল্লাও ভারী হয়।এবং

কুরআনের তিলাওয়াত একটি লাভজনক ব্যবসা।যাতে লোকসানের কোনো সুযোগ নেই। এই ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি কখনোই ক্ষতির সম্মুখীন হয় না।ফলে একে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোত্তম ব্যবসা হিসেবে অভিহিত করা যায়। এই ব্যবসা তার ব্যবসায়ীর জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক হয়। তার জন্য নেকি লাভ করার পথ খুলে দেয়। আল্লাহর ক্রোধ ও তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা করে।

আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

۞
إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتُبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦٓ إِنَّهُۥ غَفُورٌ شَكُورٌ۞ ٌ

"নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিযিক দিয়েছেন, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে, যা কখনো ধ্বংস হবে না; যাতে তিনি তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দান করেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বাড়িয়ে দেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্রাহী।”

[সূরা ফাতির,৩৫:২৯-৩০]

[যিকিরে-ফিকিরে কুরআন-বই থেকে কিছু অংশ]

১।সূরা ফাতিহা:

বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের শিফা হলো সূরা ফাতিহা।

মৃগী,গিটবাত, মাথাব্যথা, পুরাতন ক্ষত, চুলকানি ইত্যাদি যে কোন কঠিন রোগের জন্য ফজরের সুন্নত ও ফরজ নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে ৪১ বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে পানির উপর ফুঁ দিয়ে রুগীকে পান করালে আল্লাহর রহমতে রোগ নিরাময় হবে।এটি খুবই পরীক্ষিত আমল।

২।আয়াতুল কুরসী:

আয়াতুল কুরসীর ফায়দা ও বৈশিষ্ট্য অসংখ্য। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি পেশ করা হচ্ছে। রাতে ঘুমানোর আগে আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে সারারাত শয়তান ও জিন্নাতের অনিষ্টতা হতে নিরাপদ থাকা যায়।

যে ঘরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা হবে ইং শা আল্লাহ। সেই ঘরে কখনো চোর ঢুকবে না।

আয়াতুল কুরসী পাঠ করে কোন শিশুর উপর দম করলে সারা দিন তার উপর বদনজর লাগবে না।

যে বাগানে প্রতিদিন আয়াতুল কুরসী পাঠ করা হবে তা সকল প্রকার আপদ বিপদ হতে রক্ষা পাবে।

যে ব্যক্তি সকাল ও বিকাল আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার উপর কোন জাদুটোনা আছর করবে না।

মদিনা-মনোয়ারা সাতটি খেজুরের উপর সাত দিন পযর্ন্ত সাত বার আয়াতুল কুরসী পাঠ করে ফুঁ দিয়ে যাদুগ্রস্থ ব্যক্তিকে প্রতিদিন একটি করে খাওয়ালে যে কোন কঠিন জাদুর ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে।

কারো শরীরে জাদুর আছর থাকলে ভোরবেলা সূর্য উদয়ের পূর্বে গোসল করবে। অতঃপর এহরাম বেঁধে কেবলমুখী হয়ে বিসমিল্লাহ সহ এক হাজার বার আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। একুশ দিন পর্যন্ত এই আমল করবে।

ইং শা আল্লাহ তার পরের দিন জাদুর আছর নষ্ট হয়ে যাবে।

৩।সূরা ইয়াসিন:

সূরা ইয়াসিন কুরআনের অন্তর।

সূরা ইয়াসিন আল্লাহ কে রাজি করার নিয়তে পড়বে আল্লাহ থাকে সন্তুষ্ট করবেন।

হাদীস শরিফে এসেছে, যে ব্যাক্তি সুরা ইয়াসিন একবার পাঠ করবে সে দশটি কোরআনের খতমের সওয়াব পাবে।

আরেক হাদীসে আছে, যে ব্যাক্তি ধারাবাহিক ভাবে প্রত্যেক রাতে সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে এবং সে রাতে তার ইন্তেকাল হলে সে শহীদের সওয়াব পাবে।

অপর আরেক হাদিসে এসেছে যে ব্যাক্তি দিনের শুরুতে সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে, তার সমস্যাবলী থাকবে না।

৪।সূরা আরাফ:

দুঃখ বেদনা,চিন্তা,পেরেশানি,মনের অশান্তি ও অস্থিরতা দূর হবার আমল

দুঃখ বেদনা, চিন্তা, পেরেশানি, মনের অশান্তি ও অস্থিরতা জন্য ফজরের নামাজের পর বুকের উপর হাত রেখে সূরা আরাফের ১,২ আয়াত একশোবার পাঠ করলে উপকার পাওয়া যায়।

المص ۞

كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۞

"আলিফ-লাম-মীম-স্বদ।

(হে নবী! এটি) একখানি কিতাব, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে তুমি এর দ্বারা (মানুষকে) সতর্ক কর। সুতরাং এর কারণে তোমার অন্তরে যেন কোন কুণ্ঠা দেখা না দেয় এবং এটা মুমিনদের জন্য এক উপদেশবাণী।"

[সূরা আরাফ,০৭:১-২]

৫।সূরা ফজর:

রিযিক বৃদ্ধির জন্য উপরোক্ত সূরার খতম পড়লে বিশেষ উপকার হয়।

খতম পড়ার নিয়ম — সাত দিন রোজা রাখবে। প্রতিদিন সাতজন মিসকিনকে খানা খাওয়াবে এক জায়গা এক বৈঠকে বসে এই সূরা একশত একচল্লিশ বার তেলাওয়াত করবে।ইং শা আল্লাহ্ সারা বছর রিযিকের প্রাচুর্য থাকবে।

৬।সূরা কাওসার:

ব্যবসায় বরকত লাভের জন্য এই সূরা পাঠ করা হয়।

৭।সূরা নাছর:

মাকসুদ হাসিল হওয়ার আমল।

এই পবিত্র সূরা সতেরো দিন প্রতিদিন একশত তেইশ বার পাঠ করলে সকল মাকসাদ হাসিল হয়।

[হে রিযিক অন্বেষণকারী তোমাকে বলছি-বইয়ের কিছু অংশ]

৮।সূরা কাহাফ:

নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন যে, যারা জুম'আর দিনে সূরা কাহফা পড়ে, আল্লাহ তাদের জন্য সপ্তাহব্যাপী আলোর মাধ্যমে রক্ষা করবেন। এটি মুমিনের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে এবং নানাবিধ পরীক্ষায় সহায়তা প্রদান করে।

৯।সূরা মুলক:

রাসূল ﷺ বলেছেন,

যে ব্যক্তি রাতে সূরা মুলক পড়বে, তা তাকে আগের রাতের দুঃখ ও শয়তানের প্রভাব থেকে রক্ষা করবে।

হাদিসে বলা হয়েছে, সূরা মুলক পড়ার মাধ্যমে ব্যক্তি কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা পায়।

রাসূল ﷺ এর হাদিস অনুযায়ী, সূরা মুলক পড়া ব্যক্তিকে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং সূরা মুলকের প্রতি সাড়াশি আধ্যাত্মিক বরকত দেয়।

প্রতিদিন রাতে সূরা মুলক পড়ার সুন্নত রয়েছে। এটি ব্যক্তি ও তার পরিবারকে শয়তানের প্রভাব থেকে দূরে রাখে।

১০।সূরা ইখলাস:

সূরা ইখলাস এক অর্থে তাওহীদের সারসংক্ষেপ।অর্থাৎ আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন যে, এটি কোরআনের এক-তৃতীয় অংশের সমতুল্য। এই সূরা পড়ার মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর একত্বে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে। এটি রোজকার নামাজে, দোয়া ও যিকিরে পড়ার মাধ্যমে পাপ দূর ও নেকি বৃদ্ধি করে।

১১।সূরা ফালাক্ব:

সূরা ফালাক্ব শয়তান, জাদু এবং হুমকিপূর্ণ প্রাকৃতিক বিপদ থেকে রক্ষা পেতে ও আশ্রয় প্রার্থনার জন্য সুন্নত। নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন যে, সকালে ও রাতে সূরা ফালাক ও নাস একসাথে পড়া ব্যক্তি বা পরিবারকে শয়তানের হাত থেকে নিরাপদ রাখে। এটি শরীর ও মনের নিরাপত্তা, রোগ ও অনিষ্ট থেকে মুক্তি নিশ্চিত করে।

১২।সূরা নাস:

সূরা নাস মানুষের আত্মা ও মনকে শয়তানের প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য পাঠ করা হয়। এটি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার সূরা, যা ভীতিকর চিন্তা, ফিতনা ও বেদনাদায়ক পরিস্থিতি থেকে নিরাপত্তা দেয়। নবী ﷺ এর হাদিসে বলা হয়েছে যে, সকালে ও রাতে এটি পড়ার মাধ্যমে শয়তান ও মানসিক বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

১৩।সূরা কাফিরূন:নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন,এই সূরা পড়া ব্যক্তি আল্লাহর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং প্রকৃতভাবে শিরক থেকে দূরে থাকে।

নামাজে বা রাতে এটি পড়ার মাধ্যমে মুসলিমদের ধর্মীয় পরিচয় দৃঢ় হয় এবং কাফিরদের প্রলোভন ও প্রভাব থেকে আত্মাকে সুরক্ষিত রাখা যায়। সূরা কাফিরূন বিশেষ করে যে কেউ নিজের ইমান রক্ষা করতে চায়, সমাজের প্রলোভন ও বিপদ থেকে দূরে থাকতে চায়—তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই সূরাগুলো না কুরআনের সকল সূরাই বরকতময় ও উপকারী।এর আমলের দ্বারা আমরা নেকি অর্জন ও রিযিকের সংকীর্ণতা দূর করতে পারব।ইং শা আল্লাহ্।

এছাড়াও,

জীবন বাঁচানোর জন্য আমরা শ্বাস গ্রহণ করি। এটা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কোনো চেষ্টা বা সচেতনতা ছাড়াই শ্বাস গ্রহণ বর্জন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে। কুরআন কারীম আমাদের রূহের 'অক্সিজেন'। আত্মার শ্বাস। জীবন বাঁচাতে যেমন অনায়াসে নিয়মিত নিশ্বাস নিই ও ছাড়ি, কলবকে বাঁচিয়ে রাখতেও সেভাবে নিয়মিত কুরআন

তিলাওয়াত-তাদাব্বুর আবশ্যক। কিন্তু তা করা হয়ে ওঠে না। ফলে অক্সিজেন গ্রহণ করে শরীর বেঁচে থাকলেও কুরআন বর্জন করে 'রূহ' মরে যায়।

[কিছু অংশ আই লাভ কুরআন-বই থেকে]

হাদিসের আলোকে রিযিক বৃদ্ধির জন্য কিছু দু'আ

রিযিক অর্জনে এবং অভাব দূরীকরণে আল্লাহর কাছে **দু'আ** করা উচিত। কারণ তিনি প্রার্থনা কবুল করেন। আর আল্লাহ তাআ'লাই রিযিকদাতা এবং তিনি অসীম ক্ষমতাবান।
আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

۞وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۞

"আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের জন্য সারা দিবো।"
[সূরা মু'মিন,২৩:৬০]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
যে ব্যাক্তি অভাবে পতিত হয়, অতঃপর তা সে মানুষের কাছে সোর্পদ করে (অভাব দূরীকরণে মানুষের উপর নির্ভরশীল হয়)
তার অভাব মোচন করা হয় না।পক্ষান্তরে,অভাবে পতিত হয়ে এর প্রতিকারে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হয়,তবে অনতিবিলম্ব আল্লাহ তাকে প্রাচুর্য্য দিবেন।
[আবু দাউদ ১৬৪৭,তিরমিজি ২৮৯৬]

রাসুল ﷺ রিযিকের জন্য কিছু দু'আ শিখিয়ে গেছেন।

১.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مَقْبُولًا
'হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট পবিত্র রিযিক, উপকারী জ্ঞান ও মাক্ববূল আমল চাই'
[শুআবুল ঈমান,১৭৮২]

২.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالْهوانِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُظْلَمَ أَوْ أُظْلِمَ
'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট থেকে দরিদ্রতা,, স্বল্পতা ও অপমান থেকে পরিত্রাণ চাই। আর আপনার নিকট পরিত্রাণ চাই যুলুম করা হতে এবং অত্যাচারিত হওয়া থেকে।'
[আবু দাউদ,১৫৪৬]

৩.

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي رِزْقِي

'হে আল্লাহ আপনি আমার রুজিতে বরকত দান করুন।'

[মুসনাদে আহমাদ ১৯৫৮৯]

৪..

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

'হে আল্লাহ আপনি আমার জন্য আপনার হালাল রিযিক যথেষ্ট করে দিন এবং আপনার দয়া দিয়ে আমাকে অন্যের মুখাপেক্ষীতা থেকে মুক্তি দিন।'

[তিরমিজি হাদিস ৩৫৬৩]

একজন প্রকৃত মুমিন হিসেবে আমরা সবাই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর শিখিয়ে দেয়া দু'আ গুলোর মাধ্যমে আমাদের রবের নিকট আমাদের রিযিক বৃদ্ধির জন্য ফরিয়াদ করব।ইং শা আল্লাহ।

পরিশেষে

রিযিক মানবজীবনের এক অনিবার্য বাস্তবতা।যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হলেও মানুষের চেষ্টা, পরিশ্রম ও সৎকর্মের মাধ্যমে এর বরকত বৃদ্ধি পায়।যে রিযিক শুধু অর্থ-সম্পদে ও খাবার-দাবারে সীমাবদ্ধ নয়,বরং জ্ঞান,স্বাস্থ্য,চরিত্র,শান্তি,হালাল উপার্জন ও নৈতিক উন্নতি এসবই রিযিকের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন ও হাদিসে থেকে বুঝা যায় রিযিকে বরকত লাভ যা বিশ্বাস, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল ও বৈধ উপার্জনকে কেন্দ্র করে গঠিত।

হাদিসে এসেছে,
এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ–কে জিজ্ঞেস করলেন,
“আমি কি উটকে ছেড়ে আল্লাহর উপর ভরসা করব, নাকি উটকে বেঁধে তারপর ভরসা করব?”
রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন,
“উটটি বেঁধে রাখো, তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করো।”

[তিরমিজি]

মানুষ আগে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করবে, তারপর ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করবে।
অর্থাৎ, শুধু বসে বসে আল্লাহর উপর ভরসা করা নয়,
বরং **চেষ্টা + তাওয়াক্কুল** দুটোই পাশাপাশি থাকা চাই।

মানুষের দায়িত্ব হলো পরিশ্রম করা।নৈতিকতার সাথে উপার্জন করা এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখা। কারণ রিযিকের প্রকৃত মালিক আল্লাহ, এবং তিঁনিই বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা বান্দাদের রিযিক পৌঁছে দেন। রিযিক হালাল ও বরকতপূর্ণ হলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শান্তি, সন্তুষ্টি ও সফলতা এনে দেয়।আল্লাহ্ আমাদের সকলের রিযিককে বরকতের সাথে প্রসারিত করে দিতেন।আমীন ইয়া রব্বুল ‘আলামীন।